সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

মার্চ-এপ্রিল ২০১৭

আমি তোমারই নাম গাই

কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য স্মরণে

০১. ০২-০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঢাকায় সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ান অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচার্স আয়োজিত ভারত-বাংলা অটোমোটিভ শো-র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ও মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

০২. ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঢাকায় আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের উপস্থিতিতে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার বক্তব্য প্রদান

০৩. ১৬-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে ভারত-বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত ৪র্থ ইন্দো-বাংলা বাণিজ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের উপস্থিতিতে ভারতীয় হাই কমিশনারের বক্তব্য প্রদান। পরে হাই কমিশনার সিআইআই ও বিসিসিআই প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মতবিনিময় করেন ও তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন

০৪. ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ উপকূলীয় জাহাজ চলাচল চুক্তির আওতায় কলকাতা ও পানগাঁও ইনল্যান্ড কন্টেইনার টার্মিনালের মধ্যে প্রথম সরাসরি মালবাহী জাহাজ সার্ভিসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, নৌ-পরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের সঙ্গে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

০৫. ২ মার্চ ২০১৭ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এএইচএম মুস্তাফা কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সাক্ষাৎ। বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়

০৬. ১০ মার্চ ২০১৭ ঢাকার শিল্পকলা একাডেমি সামনে 'দুই বাংলার নাট্যমেলা' নামে থিয়েটার ও নাট্যোৎসবে সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরের সঙ্গে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, একাডেমির পরিচালক লিয়াকত আলী লাকী, উৎসবের আয়োজক অনন্ত হীরা ও নূনা আফরোজ উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় নাটকের মঞ্চায়নের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হয়

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ পঁয়তাল্লিশ | সংখ্যা ০৩-০৪ | ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখ ১৪২৩-২৪
মার্চ-এপ্রিল ২০১৭

Website: **www.hcidhaka.gov.in**
/IndiaInBangladesh; @ihcdhaka; /HCIDhaka
IGCC Facebook page: /IndiraGandhiCulturalCentre

Bharat Bichitra
Facebook page: /BharatBichitra

মনসা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম চরিত্র 'বেহুলা' পৃষ্ঠা: ৪৩

সূ চি প ত্র

কর্মযোগ
মহাকাশে ভারতের জয়গাথা ০৪
সশস্ত্র বাহিনির সদস্যদের পরিবারের জন্য বিশেষ ভারতীয় ভিসা ০৫
খুলনার একটি গার্লস স্কুল নির্মাণে ভারত-বাংলা সমঝোতা ০৬
মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরসূরীদের বৃত্তি প্রদান ০৬
ঢাকায় আইটেক ও আইসিসিআর দিবস ০৭
অরবিট ফ্রিকোয়েন্সি কো-অর্ডিনেশন অফ 'সাউথ এশিয়া স্যাটেলাইট' চুক্তি ০৮
ভারতীয় ফরেন সার্ভিস অফিসার ট্রেইনিদের বাংলাদেশ সফর ০৯

প্রবন্ধ
সীমার মাঝে অসীম তুমি ॥ মহুয়া মুখোপাধ্যায় ১০
গৌড়ীয় নৃত্য ॥ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ৩৭
মনসা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম চরিত্র 'বেহুলা' ॥ শামসুন নাহার জামান ৪৩

ছোটগল্প
অনিকেতন ॥ রবিউল হুসাইন ১৯
মেঘা, পিউ ও একটি আয়না
বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৪০

উচ্চ শিক্ষা
বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য ভারত সরকারের স্কলারশিপসমূহ ২২

কবিতা
শ্রীজাত ॥ নুসরাত নুসিন ॥ শামীমা চৌধুরী
শাহীন রেজা ২৪
কবির-আল চপল ॥ রবীন্দ্রনাথ ভৌমিক
সন্তোষ ঢালী ॥ শিহাব শাহরিয়ার ২৫

ধারাবাহিক
তর্পণ ॥ ঋতা বসু ২৬

রাজ্য পরিচিতি
নাগাল্যান্ড ৩১

নিবন্ধ
বাংলা কবিতায় নববর্ষ ॥ মো. আল-আমিন ১২

শেষ পাতা
নমস্য কালিকাপ্রসাদ ॥ এমিলি জামান ৪৮

১০ থেকে ১৪

সীমার মাঝে অসীম তুমি

প্রাণোচ্ছ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত, লোকগানের ভাণ্ডারী কালিকার জন্ম ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ আসামের শিলচর শহরের সেন্ট্রাল রোডে, বাড়ির নাম 'আয়ুর্বেদ ভবন'। পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্ট জেলার 'ঢাকা দক্ষিণ' যেখানে শ্রীচৈতন্যদেবেরও পূর্বপুরুষের বাস ছিল। শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারে শিলচরে কালিপ্রসাদের পরিবারের বিরাট ভূমিকা ছিল। শিলচরে কালিকাকে সবাই 'প্রসাদ' বলেই ডাকত। কালিকার বাবা রামচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী ছিলেন এবং মা বাড়িতে ঘরোয়াভাবে পূজার গান গাইতেন। কালিকার গানে হাতেহড়ি জ্যেঠা শ্যামাপদ ভট্টাচার্য ও পিসি আনন্দময়ী ভট্টাচার্যের কাছে। তাঁর কাকা মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য ছিলেন প্রখ্যাত লোকনৃত্যশিল্পী। কালিকাদের যৌথ পরিবার ছিল সাংগীতিক পরিবেশযুক্ত। পারিবারিক নাচ-গানের স্কুল ছিল 'শিলচর সংগীত বিদ্যালয়' নামে, এছাড়া একটি বিদ্যালয়ও পারিবারিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, যেটি বর্তমানে সেকেন্ডারি পর্যন্ত স্বীকৃত। এহেন পারিবারিক পরিমণ্ডলে কালিকার শৈশব-কৈশোর-যৌবন অতিবাহিত হয়।

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স: ১২৩৯
e-mail: editor.bb@hcidhaka.gov.in
শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স মো. জিলানী চৌধুরী
মুদ্রণ ডটনেট লিমিটেড
৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন ৯৫৬২১৯৮
প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই।
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

নিয়মিত পেতে চাই

আমি একজন রেডিও ডি-এক্সার– বাংলাদেশ সেনাবাহিনিতে কর্মরত। নিয়মিতভাবে ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং বেতারবিষয়ক নানা কথা হয়। আমাদের দেশের অনেক বন্ধুই আপনাদের পাঠানো ম্যাগাজিনটি নিয়মিত পেয়ে থাকেন। আমি আমার ক্লাবের জন্য ম্যাগাজিনটি নিয়মিতভাবে পেতে চাই। সদস্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ফরমটি পাঠালে তা পূরণ করে পাঠাব। আশা করছি আমাদের জন্য ম্যাগাজিনটি নিয়মিত পাঠাবেন।

মো. সোহেল রানা হৃদয়
প্রেসিডেন্টঃ ফ্রেন্ডস ডি-এক্সিং ক্লাব সুপার-সি
আই জি এস এন্ড সি
ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা -১২০৬

সংরক্ষিত থাকবে

শ্রীশ্রী গীতাসংঘ বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে আমি *ভারত বিচিত্রার* এককপি সৌজন্য সংখ্যা সরবরাহের জন্য আবেদন করছি। উল্লেখ্য যে, শ্রীশ্রী গীতাসংঘ বাংলাদেশ একটি ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন এবং সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত। এখানে প্রতিদিন কমপক্ষে ২০০-৩০০ ভক্ত ও সুধীজন যাতায়াত করেন। এখানে একটি বড় পাঠাগার আছে এবং এতে বিভিন্ন ধরনের পত্রিকা ও গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে, যা অনেকে অধ্যয়ন করেন। এখানে অনেক জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সৌজন্য কপি সরবরাহ করা হয়ে থাকে ।

আপনাদের বহুল প্রচারিত স্বনামধন্য পত্রিকাটি সরবরাহ করা হলে এটি পাঠাগারে সংরক্ষিত থাকবে, পাশাপাশি আপনাদের পত্রিকাটির প্রচারও বৃদ্ধি পাবে।

নির্মলচন্দ্র ঘোষ সাংগঠনিক সম্পাদক
শ্রীশ্রী গীতাসংঘ বাংলাদেশ
গীতা ভবন (৪র্থ তলা)
শ্রীশ্রী স্বামী ভোলানন্দগিরি আশ্রম ট্রাস্ট
১২ কে এম দাস লেন, ঢাকা-১২০৩

সুস্থ শুদ্ধ রুচির নাম ঋতুপর্ণ ঘোষ

জীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে ল্যাবরেটরিতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে মানুষটা জীবনের বর্ণিল বিক্ষিপ্ত আর বিমূঢ় চিত্রগুলো সেলুলয়েডের পর্দায় রঙিন আর আলোকময় করে তুলেছেন, তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা ঋতুপর্ণ ঘোষ। ২০১৩ সালের জুলাই মাসে *ভারত বিচিত্রা* কভার করেছে বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা ঋতুপর্ণ ঘোষকে নিয়ে– সুস্থ রুচি শুদ্ধ রুচি যার চলচ্চিত্রের প্রাণশক্তি। জীবনের বাস্তবতাকে এমন মনন আর চিন্তন শক্তি দিয়ে ঋতুপর্ণ ঘোষ আমাদের মনের আগলগুলো খুলে দিয়েছেন, যা সমসাময়িক চলচ্চিত্রের ভোল পাল্টে দিয়েছে।

বাংলায় যদি আবার কেউ অস্কার পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেতেন, তাহলে ঋতুপর্ণ ঘোষ হয়তো তাঁর ঝুড়িতে তুলতে পারতেন সে-পুরস্কার। *ভারত বিচিত্রা* এমন একটি ম্যাগাজিন, যা একজন পাঠকের শিল্পবোধের খোরাক যোগায়। আমি সুদূর গ্রাম থেকে জেলা লাইব্রেরিতে প্রতি মাসে ১৫০/- টাকা ভাড়া দিয়ে কণ্টক পথ মাড়িয়ে যাই কেবল *ভারত বিচিত্রা* পড়ব বলে। আবার সময়মত যেতে না পারলে অনেক সময় ঐ সংখ্যাটা আর পাই না। *ভারত বিচিত্রা* একটি সমৃদ্ধ পত্রিকা। এতে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সমস্ত বিষয় আদ্যোপান্ত থাকে। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে আমাদের এলাকায় একজনের বাড়িতে ছোট্ট একটা পাঠাগার করেছি। আমাদের জোর আবেদন, আমাদের *ভারত বিচিত্রার* নিয়মিত গ্রাহক করে সৌহার্দ সম্প্রীতি আর মৈত্রীর সেতুবন্ধনে আবদ্ধ করবেন।

ঋতুপর্ণ ঘোষের জন্ম ১৯৬৩ সালের ৩১ আগস্ট কলকাতায়। এত তাড়াতাড়ি উনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন তা ভাবিনি। ওঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। *ভারত বিচিত্রা* '...এবং ঋতুপর্ণ' নামে যে প্রচ্ছদ করেছে সে-জন্য সম্পাদককে ধন্যবাদ। জীবন্ত কিংবদন্তী ঋতুপর্ণ বেঁচে থাকলে হয়তো-বা আমাদের ঝুলিতে অস্কারের মত পুরস্কার চলে আসত। নিজের মেধা আর মনন দিয়ে উনি বাঙালি মধ্যবিত্ত দর্শকদের হলমুখী করেছেন। মোট ১২বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত এই পরিচালকের মৃত্যুতে শুধু ভারত নয়, সমগ্র বিশ্বে যেন শোকের মাতম বইছে। বাংলা ছবিকে অনেক কিছু দিয়েছেন ঋতুপর্ণ। টলিউডের দুঃসময়ে মধ্যবিত্ত বাঙালিকে উনি হলমুখী করে প্রমাণ করেছেন যে এখানে এখনো ভাল ছবি হয়। ঋতুপর্ণ ঘোষ মানেই যেন ছিল জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। আমরা যারা পাঠাগারের সদস্য তারা সবাই মিলে ঋতুপর্ণ ঘোষের বেশ কিছু ছবি একসঙ্গে দেখেছি। *চোখের বালি* ছবিটা কম করে হলেও সাতবার দেখেছি। পরিশেষে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি সম্পাদককে, বিশেষ করে এমন গুণী মানুষকে *ভারত বিচিত্রায়* স্থায়ী করে রাখার জন্য।

সালেহ বায়েজীদ
বন্ধু পাঠাগার, বাড়ি নং ৮১
৭ নং ওয়ার্ড, মনোহরদী পৌরসভা, নরসিংদী

নিয়মিত পাচ্ছি না

আমি দৈনিক বিষাণ-এর বার্তা সম্পাদক, এ যাবৎ নিয়মিত আপনার সম্পাদিত *ভারত বিচিত্রা* পত্রিকাটি পেতাম। কিন্তু বিগত বছরের শেষ থেকে বর্তমান বছরের মার্চ পর্যন্ত নিয়মিত *ভারত বিচিত্রা* পাচ্ছি না। সম্ভবত কোন কারণবশত আমার ঠিকানায় আপনাদের পত্রিকা প্রেরণ করা হচ্ছে না। অনুগ্রহ করে বিষয়টি খতিয়ে দেখে পুনরায় আমার ঠিকানায় নিয়মিত আপনাদের বহুল প্রচারিত পত্রিকাটি প্রেরণ করে বাধিত করবেন।

নূর মোহাম্মদ নূরু
বার্তা সাম্পাদক, দৈনিক বিষাণ
৭/৭, আলী এ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট (চতুর্থ তলা)
সাতমসজিদ, বসিলা রোড, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭

বিকল্প নেই

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ *ভারত বিচিত্রা* বাংলাদেশ এবং ভারতের জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করেছে। দু'দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি গল্প প্রবন্ধ উপন্যাস কবিতা যেন একইসূত্রে গাঁথা। বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী দেশ ভারত সম্পর্কে জানতে হলে একমাত্র জনপ্রিয় *ভারত বিচিত্রা* পড়া চাই এবং এর কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানের কথা বলে শেষ করা যাবে না। আমি দীর্ঘদিন যাবত নিয়মিতভাবে *ভারত বিচিত্রা* পাঠ করেছি। ১৯৮৯ সালে পাবনা থেকে আমি ঢাকায় চলে আসি। এরপর থেকে আর নিয়মিতভাবে পত্রিকাটি পড়া হয়নি। মাঝে মাঝে বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে পড়ে থাকি। নিয়মিত পড়তে চাইলে উপায় কি?

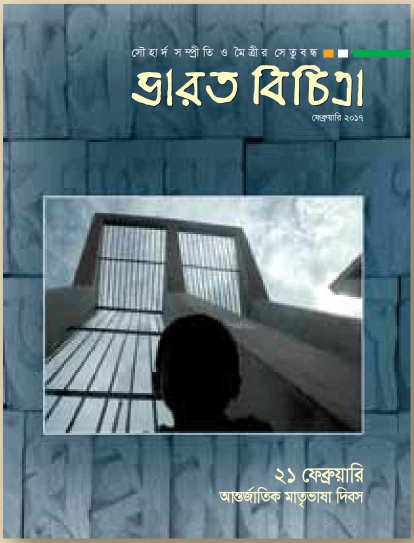

সৈয়দ একরামুল হক
প্রিন্সিপাল অফিসার, অগ্রণী ব্যাংক লি.
তেজগাঁও শিল্প এলাকা কর্পোরেট শাখা
৩১৫/এ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২১৫

নির্ভরযোগ্য মনে করি

বহুল প্রশংসিত *ভারত বিচিত্রার* গ্রাহক হিসেবে চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়ায় অবস্থানকালে আপনাদের সরবরাহকৃত মাসিক সংখ্যাটি যথাসময়ে আমার ঠিকানায় পৌঁছে যেত। বেশ কিছুদিন হল আমার নিজ অঞ্চল বরিশালে আসার পর নানান ব্যস্ততায় ঠিকানা পরিবর্তনের বিষয়টি আপনাদের অবহিত করা হয়নি; আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করাও হয়নি। প্রায় সমাপ্তির পথের চাকরিজীবনে সময় কাটানোসহ মনের খোরাক ও চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হিসেবে *ভারত বিচিত্রাকে* নির্ভরযোগ্য মনে করি। আমার বর্তমান কর্মস্থলে কি *ভারত বিচিত্রা* পাঠানো সম্ভব?

নিখিলচন্দ্র মিশ্র
অফিসার, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
বরিশাল কর্পোরেট শাখা, বরিশাল

গবেষণামূলক হওয়ায়

আমি ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন থেকে প্রকাশিত মাসিক *ভারত বিচিত্রা* পড়তে ইচ্ছুক। পত্রিকাটি গবেষণামূলক হওয়ায় তা পড়ে আমি ভারতের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারি। তা ছাড়া, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনেক বিষয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের মিল থাকায় ভারতকে ভালভাবে জানার জন্য *ভারত বিচিত্রা* নিয়মিত পড়া আবশ্যক। তাই সব সময় এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে চাই। আমাকে *ভারত বিচিত্রার* সঙ্গে সব সময় সংযুক্ত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

কাজী নেয়ামুল শাহীন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
সরকারি খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
খালিশপুর, খুলনা

কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। অতি সম্প্রতি এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় এ সময়ের জনপ্রিয় লোকগায়ক ও লোকসংগীত গবেষক নিহত হন। তিনি তাঁর গানের দল দোহারকে নিয়ে গত ৭ মার্চ ২০১৭ সিউড়িতে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। সকাল ১০টার দিকে তার গাড়ির চাকা পাংচার হয়ে রাস্তার পাশের খাদে উল্টে পড়ে। হাসপাতালে নেবার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত করেন। অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় দৈহিক অস্তিত্ব হারিয়ে গেলেও সৃজনসরোবরে কালিকা নিয়ত সঞ্চরমান। আমরা তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

দেখতে দেখতে পুরনোকে বিদায় দিয়ে আরেকটি নতুন বছর আমাদের জীবনে উপস্থিত হল। আজ প্রভাতপাখির আনন্দ গানে যে দিনটির সূচনা, তা যেমন একটি বছরের সূচনালগ্ন, তেমনি আমাদের বয়সের ক্ষণগণনায় আরেকটি বছরের সংযোজন। নতুন বছরের এই শুভক্ষণে সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা ও প্রীতিসম্ভাষণ। দিনযাপনের গ্লানি পেরিয়ে আজ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে দিনটি আমাদের জীবনে এল, তা সফল হোক সার্থক হোক, এই কামনা।

বাংলা নতুন বছর মানে পরিধানে লাল-সাদার আশ্চর্য সম্মিলন; পয়লা বৈশাখ মানে ফুলের সাজে নিজেকে সাজিয়ে অন্যের চোখের দর্পণে জীবনের সার্থকতা খোঁজা, পয়লা বৈশাখ মানে পান্তা-ইলিশ, পিঠা-পায়েশ আর ভুরিভোজে মনোনিবেশ। সারা বছর যেন এমনি হাসি-আনন্দে, শোভন পোশাকে-আশাকে, সুস্বাদু পানে-ভোজনে কেটে যায়, তাই বছরের প্রথম দিনটিকে আমরা অপূর্ব করে সাজিয়ে তুলতে চাই। এ যেন নিজের সঙ্গে নিজের প্রতিযোগিতা– ভাল থাকার, ভালবাসার, ভাল রাখার।

বাংলা রেনেসাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল রবীন্দ্রনাথ নতুন বছরের প্রথম মাসটিকে আবাহন করেছিলেন তাঁর অনুপম গানে, 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো... ।' শান্তিনিকেতনে তাঁর বর্ষবরণের উৎসবের কথা আজ কে-না জানে! তাঁরই শান্তিনিকেতনে পড়া, তাঁরই ভাবশিষ্য সনজীদা খাতুন-ওয়াহিদুল হকসহ ছায়ানটের শিল্পীরা ষাটের দশকে রমনা বটমূলে বর্ষবরণের আয়োজন করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তথা ঢাকায় বৈশাখকে স্বাগত জানানোর আনুষ্ঠানিকতা শুরু করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে বাঙালিয়ানা নতুন মাত্রা পায়। এখন বাংলাদেশের সর্বত্র 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো...' যেন বর্ষ-আবাহনের জাতীয় সংগীত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মেলা, বাংলা গানের অনুষ্ঠান, রমনা বটমূলে বর্ষবরণ, চারুকলার মঙ্গল শোভাযাত্রা... সব মিলিয়ে পয়লা বৈশাখ যেন এক সার্বজনীন উৎসব।

এর আগে মোঘল সম্রাট আকবর ফসল কাটার পরে চাষীর ঘরে কিছু পয়সা-কড়ি থাকে, এই বিবেচনায় খাজনাপাতি আদায়ের সুবিধার্থে বৈশাখ মাসকে বছরের সূচনা মাস হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। সেই থেকে হালখাতার সূচনা। মহাজন-খাতকের দেনা-পাওনার হিসেব চুকানোর আয়োজন চলে খেরোখাতার পাতায় পাতায়। হালখাতার মিঠাই খায়নি, এমন বাঙালিসন্তান খুঁজে পাওয়া ভার।

পুরনো স্মৃতি মুছে বসন্তের ক্ষণস্থায়ী যৌবন বিদায় নিতেই প্রখর তপনতাপে প্রকৃতিতে ফুটে ওঠে জীর্ণতা, ম্লানতা। সেই গ্লানিরও একসময় অবসান ঘটে। তারপর এক একটা দিন অন্যরকম। মেঘের পর মেঘ জমতে থাকে ঈশানকোণে। খ্যাপা ভৈরবের মত বিষাণ বাজিয়ে মেঘের ডম্বরুর সঙ্গে প্রলয় নাচনে দশদিক আচ্ছন্ন করে দিনশেষে ঝাঁপিয়ে পড়ে কালবোশেখী। সন্ধ্যায় মরণ ছোবলে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে তার বিদায়ের পরে আকাশে তারা ফোটে। ক্ষণকাল আগের রুদ্ররূপের কিছুমাত্র যেন মনে থাকে না প্রকৃতির। পত্রপল্লবে প্রাণের উৎসব লেগে যায়...

মহাকাশে ভারতের জয়গাথা

ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (আইএসআরও) ভারতীয় সময় ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সকাল ৯.২৮ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশযান উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে ১০৩টি সহযাত্রী কৃত্রিম উপগ্রহসহ ৭১৪ কেজি ওজনের কার্টোস্যাট-২ সিরিজের কৃত্রিম উপগ্রহটি আইএসআরও-র পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিক্যাল (পিএসএলভি)-সি ৩৭ যোগে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করেছে।

পিএসএলভি-সি ৩৭-এর একসঙ্গে ১০৪টি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ

একক কোন মিশনে এতগুলি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করার এটি সর্বোচ্চ সংখ্যা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই অসামান্য কৃতিত্বের জন্য মহাকাশ গবেষক ও জাতিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এটি পিএসএলভি-র ৩৮তম ধারাবাহিক সফল মিশন। পূর্ব-নির্ধারিত ক্রম অনুযায়ী পিএসএলভি-র চতুর্থ পর্যায় থেকে ১০৪টি কৃত্রিম উপগ্রহ সফলভাবে পৃথক করা হয়েছিল। বর্তমানে পিএসএলভি উৎক্ষেপিত ভারতীয় কৃত্রিম উপগ্রহের মোট সংখ্যা ৪৬।

কার্টোস্যাট-২ সিরিজের কৃত্রিম উপগ্রহটি থেকে প্রাপ্ত চিত্রগুলি মানচিত্রাংকন শৈলী, নগর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রায়োগিক কৌশল নির্ধারণ, উপকূলীয় ভূমি ব্যবহার, উপযোগিতামূলক কার্যব্যবস্থাপনা যেমন সড়ক নেটওয়ার্ক তদারকি, পানি বন্টন, ভৌগোলিক ও মনুষ্যসৃষ্ট বিষয়াদি এবং বিভিন্ন ভূমি তথ্য পদ্ধতি (এলআইএস) এবং ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতির (জিআইএস) পরিবর্তন ঘটাতে সহায়ক হবে। এর তথ্য-উপাত্তগুলি আমরুত পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ৫০০ শহর সৃষ্টির নগরায়ন পরিকল্পনায় ব্যবহার করা যেতে পারে। আইএসআরও-র ন্যানো কৃত্রিম উপগ্রহ আইএনএস-১ এবং আইএনএস-২ দুটিও উৎক্ষেপণ করা হয়।

এছাড়া, আন্তর্জাতিক পরিমাত্রায় ছয়টি দেশের আরও ১০১টি বিদেশি ন্যানো কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ৯৬টিই যুক্তরাষ্ট্রের এবং ইসরায়েল, কাজাখস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, নেদারল্যান্ডস ও সুইজারল্যান্ডের একটি করে কৃত্রিম উপগ্রহ রয়েছে। এই সফল উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে ভারতের পিএসএলভি উৎক্ষেপিত বিদেশি কৃত্রিম উপগ্রহের সংখ্যা দাঁড়াল ১৮০।

এই মিশনটিকে অনেকগুলি কারিগরি বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল যেমন একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে একটি একক মিশনে একসঙ্গে এত বিপুলসংখ্যক কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ এবং ১০৪টি কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথ পরিক্রমণকালে সেগুলির মধ্যে পর্যাপ্ত বিচ্যুতি নিশ্চিত করা। পাশাপাশি, পরবর্তী কক্ষপথ পরিক্রমণের আয়ুষ্কালও ছিল এই মিশনের আরেকটি জটিলতা। এই উৎক্ষেপণের মাধ্যমে আইএসআরও মহাকাশ উদ্যোগসমূহের একটি আস্থাভাজন অংশীদার হিসেবে তার নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পরিচিতি পুনরায় জোরদার করল।

ঢাকায় বিএসএফ মহাপরিচালকের ব্যস্ত সফর

১৮-২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঢাকায় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সেস (বিএসএফ) এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-র মধ্যে ৪৪তম বর্ডার কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিএসএফ মহাপরিচালক শ্রী কে কে শর্মা, আইপিএস ১৪-সদস্যের ভারতীয় এবং বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবুল হোসেন, এনডিসি, পিএসসি ২৬-সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। বিএসএফ মহাপরিচালক বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান কামালের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হন

সশস্ত্র বাহিনির সদস্যদের পরিবারের জন্য বিশেষ ভারতীয় ভিসা

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টর সেনা মালঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সশস্ত্র বাহিনি বিভাগের সহযোগিতায় ভারতীয় হাই কমিশন কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনির সদস্যদের পরিবারের লোকদের জন্য এক ভিসা ক্যাম্পের আয়োজন করে। ক্যাম্পটি যৌথভাবে উদ্বোধন করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা এবং সশস্ত্র বাহিনি বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লে. জেনারেল মাহফুজুর রহমান, আরসিডিএস, এএফডবিউসি, পিএসসি, পিএইচডি।

ভারতীয় হাই কমিশন সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ভারতীয় ভিসা প্রাপ্তি প্রক্রিয়াকে গতিশীল ও সহজ করতে অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে। ঈদের ছুটির আগে জুন মাসে একটি ভিসা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় যেখানে ৫৫,০০০-এরও বেশি বাংলাদেশী নাগরিককে ট্যুরিস্ট ভিসা দেওয়া হয়। ছাত্রছাত্রীদের জন্য একই রকমের আরেকটি ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় যেখানে ২,০০০ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

ভিসা প্রাপ্তি সহজতর করতে সরাসরি ট্যুরিস্ট ভিসা স্কিমের আওতায় যে কেউ তাদের নিশ্চিত বিমান/সড়ক/রেল টিকেটসহ কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই ভারতীয় ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার (আইভিএসি)-এর ৯টি শাখাতেই তাদের ভিসার আবেদনপত্র জমা দিতে পারেন; বয়স্ক নাগরিক ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করা হয়েছে; ৬৫ বছরের বেশি বয়স্কদের জন্য ৫ বছর মেয়াদী ভিসা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে; মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং মহিলা আবেদনকারী ও তাদের নিকট আত্মীয়দের জন্য আইভিএসি-র মিরপুর শাখা শনিবার বিশেষভাবে খোলা রাখা হচ্ছে এবং কূটনীতিক ও কর্মকর্তাদের পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যরা তাদের ট্যুরিস্ট ভিসার আবেদনপত্র সরাসরি আইভিএসি-এর উত্তরা শাখায় জমা দিতে পারেন।

ট্যুরিস্ট ভিসার নিয়ম শিথিলকরণ

বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য ভারতীয় ভিসা প্রাপ্তি সহজতর ও সাধারণ করার চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ট্যুরিস্ট ভিসার আবেদনকারীরা ভারতে যাওয়ার নিশ্চিত বিমান টিকেটসহ সরাসরি সাক্ষাৎ করতে এবং ভারত ভ্রমণের তারিখের তিন মাস পূর্বে তাদের ভিসার আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন। বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী, আবেদনকারীরা সরাসরি সাক্ষাৎ করতে এবং ভারত ভ্রমণের তারিখ থেকে এক মাস পূর্বে আবেদনপত্র জমা দিতে পারতেন। এই শিথিলকরণ প্রক্রিয়া ১ এপ্রিল ২০১৭ থেকে রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর, ময়মনসিংহ, বরিশাল এবং ঢাকার মিরপুরের আইভিএসিসহ ৯টি ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রে কার্যকরী হচ্ছে।

সরাসরি ট্যুরিস্ট ভিসা স্কিমটি ২০১৬ সালের অক্টোবরে ঢাকায় মহিলা ভ্রমণকারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রথম চালু করা হয়, যা পরবর্তীকালে সকল আবেদনকারীর জন্য ও ঢাকার বাইরের সকল আইভিএসিতে সম্প্রসারণ করা হয়। এই স্কিমের আওতায়, আবেদনকারীরা নিশ্চিত টিকেটসহ (বিমান, ট্রেন ও অনুমোদিত বাস সার্ভিস) সরাসরি সাক্ষাৎ করতে পারবেন এবং তাদের নিজেদের জন্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য নয়টি আইভিএসিতে কোন পূর্ব নির্ধারিত অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট তারিখ ছাড়াই ট্যুরিস্ট ভিসার আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

খুলনার একটি গার্লস স্কুল নির্মাণে ভারত-বাংলাদেশ সমঝোতা

৮ মার্চ ২০১৭ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে খুলনার খালিশপুরে একটি গার্লস স্কুলের নির্মাণ প্রকল্পের জন্য এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। 'বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প' কর্মসূচির আওতায় ভারত সরকারের অর্থায়নে এ প্রকল্পের মোট খরচ ১২ কোটি ৮ লাখ টাকা। স্কুল ভবন নির্মাণ ছাড়াও প্রকল্পের মধ্যে স্কুলের জন্য যাবতীয় আসবাবপত্র, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ফটোকপি মেশিন, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও একটি ৩৩-আসনের স্কুল বাস অন্তর্ভুক্ত। সমঝোতা স্মারকটি আন্তর্জাতিক নারী দিবসে স্বাক্ষরিত হল, যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

এই সমঝোতা স্মারক ও খুলনা-কলকাতা রেল সংযোগ যা শিগগিরই চালু হতে যাচ্ছে, খুলনার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ট বন্ধনের কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেবে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা এ ব্যাপারে ভারত সরকারের পক্ষে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ঊর্ধ্বতন সচিব কাজী শফিকুল আজম, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. মনিরুজ্জামান মনি। অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয় ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

শিলাইদহে রবীন্দ্রভবন নির্মাণে আর্থিক সহায়তা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পারিবারিক জায়গা কুষ্টিয়ার শিলাইদহের কুঠিবাড়ি কমপ্লেক্সে রবীন্দ্রভবন নির্মাণে ভারত বাংলাদেশ সরকারকে ১৮.১৭ কোটি টাকা আর্থিক অনুদান দিচ্ছে। এ বিষয়ে ৯ মার্চ ২০১৭ শিলাইদহে দুই সরকারের মধ্যে এক আর্থিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশে ভারতের হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ভারত সরকারের পক্ষে আর্থিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ঊর্ধ্বতন সচিব কাজী শফিকুল আজম। ভারতীয় হাই কমিশন ঢাকা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি), অর্থ মন্ত্রণালয় ও পুরাতত্ত্ব বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার এবং বাংলাদেশ সরকারের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জি ২০১৩-এর মার্চে তাঁর বাংলাদেশ সফরকালে সর্বপ্রথম প্রকল্পটি ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি ৭ জুন ২০১৫ প্রকল্পটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রস্তাবিত রবীন্দ্রভবনে ঠাকুর পরিবারের ঐতিহ্য তুলে ধরতে একটি অত্যাধুনিক প্রদর্শনী গ্যালারি, প্রজেকশন সুবিধা, রবীন্দ্রনাথ রচিত ও সুরোরাপিত সংগীত ও নৃত্যবিষয়ক পাঠদান কক্ষ, রবীন্দ্রনাথসম্পর্কিত গ্রন্থ সংরক্ষণ পাঠাগার, হস্তশিল্পালয় ছাড়াও অন্যান্য সুবিধাদি যেমন অতিথিশালা, ক্যাফেটেরিয়া, মুক্তমঞ্চ অথবা অ্যাম্ফিথিয়েটার ইত্যাদি থাকবে।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরসূরীদের ভারত সরকারের বৃত্তি প্রদান

১৫ মার্চ ২০১৭ ঢাকার জাতীয় জাদুঘরে ভারতীয় হাই কমিশন ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা একাডেমির যৌথভাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরাধিকারদের বৃত্তির চেক প্রদান করা হয়। মাননীয় অর্থমন্ত্রী ও আবুল মাল আব্দুল মুহিত এমপি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন। অনুষ্ঠানে পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী লেফটেনেন্ট কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীরপ্রতীক এমপি ছাড়াও বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা এবং সম্মানিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

২০০৬ সাল থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরাধিকারদের জন্য ভারত সরকার মুক্তিযোদ্ধা স্কলারশিপ স্কিম চালু করে। বৃত্তিটি উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতকপূর্ব ছাত্রছাত্রীদের প্রদান করা হয়। স্নাতকপূর্ব পর্যায়ের একজন ছাত্র/ছাত্রী চার বছরে জন্য প্রতি বছর ২৪,০০০ হাজার টাকা এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের একজন ছাত্র/ছাত্রী দুই বছরের জন্য প্রতি বছর ১০,০০০ হাজার টাকা করে পান। এখন পর্যন্ত ১০,৩৩৬ জন ছাত্রছাত্রী উপকৃত হয়েছেন এবং এসকল ছাত্রছাত্রীদের ১৫ কোটিরও বেশি টাকা প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেক জেলা থেকে মেধার ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রী বাছাই করা হয়।

বক্তৃতাকালে হাই কমিশনার বলেন, 'অভিন্ন ঐতিহ্য, ইতিহাস ও ভৌগোলিক বুনিয়াদের উপর আমাদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আমাদের সহযোগিতা, গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতি অভিন্ন অঙ্গীকার এবং মানবিক মূল্যবোধ আমাদের এক-অপরের সহযোগী করে তুলেছে। আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিই এবং এ বন্ধন টিকিয়ে রাখতে ও দৃঢ় করতে আমরা কাজ করব যাতে তা আরও সুদৃঢ় হয় এবং আমাদের জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে।'

ঢাকায় আইটেক ও আইসিসিআর দিবস উদ্‌যাপন

২০ মার্চ ২০১৭ ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন কাকরাইলের আইডিইবি ভবনের মুক্তিযোদ্ধা মেমোরিয়াল হলে ইন্ডিয়ান টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনোমিক কো-অপারেশন (আইটেক) প্রোগ্রাম এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ কালচারাল রিলেশনস (আইসিসিআর) দিবস উদযাপন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এএইচএম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি।

আইটেক প্রোগ্রাম ইন্ডিয়ান টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনোমিক কো-অপারেশন এবং সাউথ-সাউথ কো-অপারেটিভ স্ট্রাটেজি-র কাঠামোর আওতায় ইন্ডিয়ার ডেভলপমেন্ট অ্যাসিসট্যান্স প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ভারতের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা এবং সঠিক প্রযুক্তির সুবিধা প্রদান করছে। প্রতি বছর বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন– হিসাব, নিরীক্ষা, ব্যবস্থাপনা, এসএমই, গ্রামীণ উন্নয়ন, সংসদীয় বিষয়াবলি ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য ১৬১টি সহযোগী দেশে ১০,০০০-এরও বেশি প্রশিক্ষণপর্বের আয়োজন করা হয়।

২০০৭ সাল থেকে আইটেক প্রোগ্রামের আওতায় ভারতে ২,৬০০-এরও বেশি তরুণ বাংলাদেশী পেশাজীবী স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদে বিশেষ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭২ সাল থেকে ভারত সরকার বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস (আইসিসিআর)-এর মাধ্যমে শিক্ষাবৃত্তি দিয়ে আসছে। চিকিৎসা শাস্ত্র ব্যতীত শিক্ষার সকল শাখায় সকল পর্যায়ে (স্নাতক থেকে পিএইচডি পর্যন্ত) আইসিসিআর শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। এ যাবৎ ৩,০০০-এরও বেশি মেধাবী বাংলাদেশী শিক্ষার্থীকে ভারতে অধ্যয়নের জন্য আইসিসিআর শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। এঁরা সকলেই বাংলাদেশ এবং দেশের বাইরে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

গণ্যমান্য অতিথিবৃন্দের পাশাপাশি সর্বস্তরের প্রায় ৫০০জন প্রাক্তন আইটেক ও আইসিসিআর শিক্ষার্থী ২০ মার্চ ২০১৭-এর আইটেক ও আইসিসিআর দিবসে অংশগ্রহণ করেন। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রাক্তন আইসিসিআর শিক্ষার্থীরা একটি ছোট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। এতে লোকসংগীত পরিবেশন করেন মনিরা ইসলাম পাপ্পু; রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন স্বনামধন্যা শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা এবং 'অনামিকা সাগরকন্যা' শীর্ষক নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন পূজা সেনগুপ্ত ও তাঁর দল তুরঙ্গমী রেপার্টরি ড্যান্স থিয়েটার।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

১২ মার্চ ২০১৭ ভারতীয় হাই কমিশনের নতুন কমপ্লেক্সে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা আয়োজিত অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের শিল্প আধিকারিকগণ বেসরকারি খাতে উদ্যোগের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে শক্তিশালী অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব গড়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে ৩৫জন শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতির মধ্যে বেক্সিমকোর ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি খাতবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, এফবিসিসিআই-এর প্রেসিডেন্ট মাতলুব আহমেদ এবং বসুন্ধরা গ্রুপের আহমেদ সোবহান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন

অরবিট ফ্রিকোয়েন্সি কো-অর্ডিনেশন অফ ‘সাউথ এশিয়া স্যাটেলাইট’ সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষর

২৩ মার্চ ২০১৭ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ‘সাউথ এশিয়া স্যাটেলাইট’-এর ওপর “অরবিট ফ্রিকোয়েন্সি কো-অর্ডিনেশন অফ প্রোপোজড এট ৪৮০ই” নামে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা এবং বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি)-র চেয়ারম্যান শাহজাহান মাহমুদ এতে স্বাক্ষর করেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ভারত সরকারের ‘সাউথ এশিয়া স্যাটেলাইট’-এর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হল।

ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন–আইএসআরও)-র মাধ্যমে ভারত দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলসমূহে সেবাদানের জন্য আইএসআরও-র জিওসিনক্রো-নাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল (জিএসএলভি এমকে-টু) ব্যবহার করে ১২-কু ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডার্স (প্রতিটি ৩৬ মেগাহার্জ)-এর সঙ্গে ২টন শ্রেণীর যোগাযোগ স্যাটেলাইট চালু করবে। স্যাটেলাইট সিস্টেমের আওতায় প্রস্তাবিত আবেদনটির মধ্যে রয়েছে টেলিকমিউনিকেশন, টেলিমেডিসিন ও ইন্টার-গভর্নমেন্ট নেটওয়ার্কস, দুর্যোগ অবস্থায় জরুরি যোগাযোগ, টেলিভিশন ব্রডকাস্ট এবং ডিটিএইচ টেলিভিশন সার্ভিস।

প্রত্যেকটি অংশগ্রহণকারী দেশ তাদের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য ৩৬ থেকে ৫৪ মেগাহার্জ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সার্বক্ষণিক সেবা দানকারী ট্রান্সপোন্ডারের সুবিধা পাবে। প্রত্যেকটি দেশই বিষয়বস্তু সংযোজন ও এর ব্যবহারের জন্য দায়ী থাকবে।

২০১৪ সালে কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ‘ভারতের প্রতিবেশীদের জন্য উপহার’ হিসেবে স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণের ঘোষণা দেন। এই স্যাটেলাইটটি দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের উন্নয়ন এবং অঞ্চলটির উন্নয়নের জন্য অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি বিনিময়ে ভারতের প্রতিজ্ঞার প্রতিফলন। পাকিস্তান ছাড়া সকল দক্ষিণ এশীয় দেশ এই অনন্য পরিকল্পনার অংশ, যেটি অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের জনগণের সুবিধার জন্য একটি সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে অঞ্চলটিকে একসূত্রে গাঁথবে।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

ভারতীয় সেনাপ্রধানের বাংলাদেশ সফর

৩১ মার্চ ২০১৭ বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল আবু বেলাল মুহাম্মদ শফিউল হক, এসবিপি, এনডিসি, পিএসসি-র আমন্ত্রণে ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল বিপীন রাওয়াত, ইউওয়াইএসএম, এভিএসএম, ওয়াইএসএম, এসএম, ভিএসএম তিনদিনের সফরে ঢাকায় আসেন। এ সফর উভয় দেশের সশস্ত্র বাহিনির মধ্যে চলমান উচ্চ পর্যায়ের বিনিময়ের অংশ। ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের গুরুত্ব বিবেচনা করে ভারতীয় সেনাপ্রধান তার আন্তর্জাতিক সফরের প্রথমেই বাংলাদেশে এলেন। তাঁর সফরসঙ্গীদের মধ্যে স্ত্রী শ্রীমতী মধুলিকা রাওয়াত ছাড়াও চার সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ছিলেন। প্রতিনিধিদলটি বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং ঊর্ধ্বতন সামরিক নেতৃত্ববৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জেনারেল রাওয়াত মিরপুরের ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে অধ্যয়নরত অফিসারদের সঙ্গেও দেখা করেন। তাঁর ৫/১১ জিআর বাহিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং পীরগঞ্জ, গোরাঘাট, গোবিন্দগঞ্জ শ্যাওলাকান্দি, মহাস্থান সেতু ও বগুড়ায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সফরকালে তিনি এসব যুদ্ধক্ষেত্রের কয়েকটি পরিদর্শন করেন

ভারতীয় ফরেন সার্ভিস অফিসার ট্রেইনিদের বাংলাদেশ সফর

১২ মার্চ ২০১৭ থেকে ভারতীয় ফরেন সার্ভিস অফিসার ট্রেইনি ২০১৬ ব্যাচের কর্মকর্তারা এক পরিচিতিমূলক ভ্রমণে বাংলাদেশ সফর করেন। প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তারা হাই কমিশন আয়োজিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর যোদ্ধা, হোলি উৎসবে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় নাগরিকবৃন্দ, ভিসা ও কনস্যুলার কার্যক্রম এবং পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে হাই কমিশনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তারা বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম এমপির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে তাদের বাংলাদেশী প্রতিপক্ষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তাঁরা বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ পরিদর্শনে যান এবং তরুণ সাংসদের সঙ্গে আলাপ করেন। হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা তাঁদের সম্মানে এক সংবর্ধনার আয়োজন করেন এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব সেখানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশিষ্ট তরুণ ব্যক্তিত্বরা অংশগ্রহণ করেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থীরা সুন্দরবনসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র পরিভ্রমণ করেন এবং ভৈরব, রূপসা, মংলা ও নড়াইলের কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের আগে পেট্রাপোল সমন্বিত চেক পোস্ট পরিদর্শন করেন।

সীমার মাঝে অসীম তুমি

মহুয়া মুখোপাধ্যায়

কালিকাপ্রসাদ অবয়ব তোমার সীমায়িত, জীবন তোমার সীমায়িত কিন্তু তোমার ব্যাপ্তি অসীম। প্রাণোচ্ছল, বুদ্ধিদীপ্ত, লোকগানের ভাণ্ডারী কালিকার জন্ম ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ আসামের শিলচর শহরের সেন্ট্রাল রোডে, বাড়ি নাম 'আয়ুর্বেদ ভবন'। পূর্বপুরুষের আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্ট জেলার 'ঢাকা দক্ষিণ' যেখানে শ্রীচৈতন্যদেবেরও পূর্বপুরুষের বাস ছিল। শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারে শিলচরে কালিপ্রসাদের পরিবারের বিরাট ভূমিকা ছিল। শিলচরে কালিকাকে সবাই 'প্রসাদ' বলেই ডাকত। কালিকার বাবা রামচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী ছিলেন এবং মা বাড়িতে ঘরোয়াভাবে পূজার গান গাইতেন। কালিকার গানে হাতেখড়ি জ্যেঠা শ্যামাপদ ভট্টাচার্য ও পিসি আনন্দময়ী ভট্টাচার্যের কাছে। তাঁর কাকা মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য ছিলেন প্রখ্যাত লোকনৃত্যশিল্পী। কালিকাদের যৌথ পরিবার ছিল সাংগীতিক পরিবেশযুক্ত। পারিবারিক নাচ-গানের স্কুল ছিল'শিলচর সংগীত বিদ্যালয়' নামে, এছাড়া একটি বিদ্যালয়ও পারিবারিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, যেটি বর্তমানে সেকেন্ডারি পর্যন্ত স্বীকৃত। এহেন পারিবারিক পরিমণ্ডলে কালিকার শৈশব-কৈশোর-যৌবন অতিবাহিত হয়।

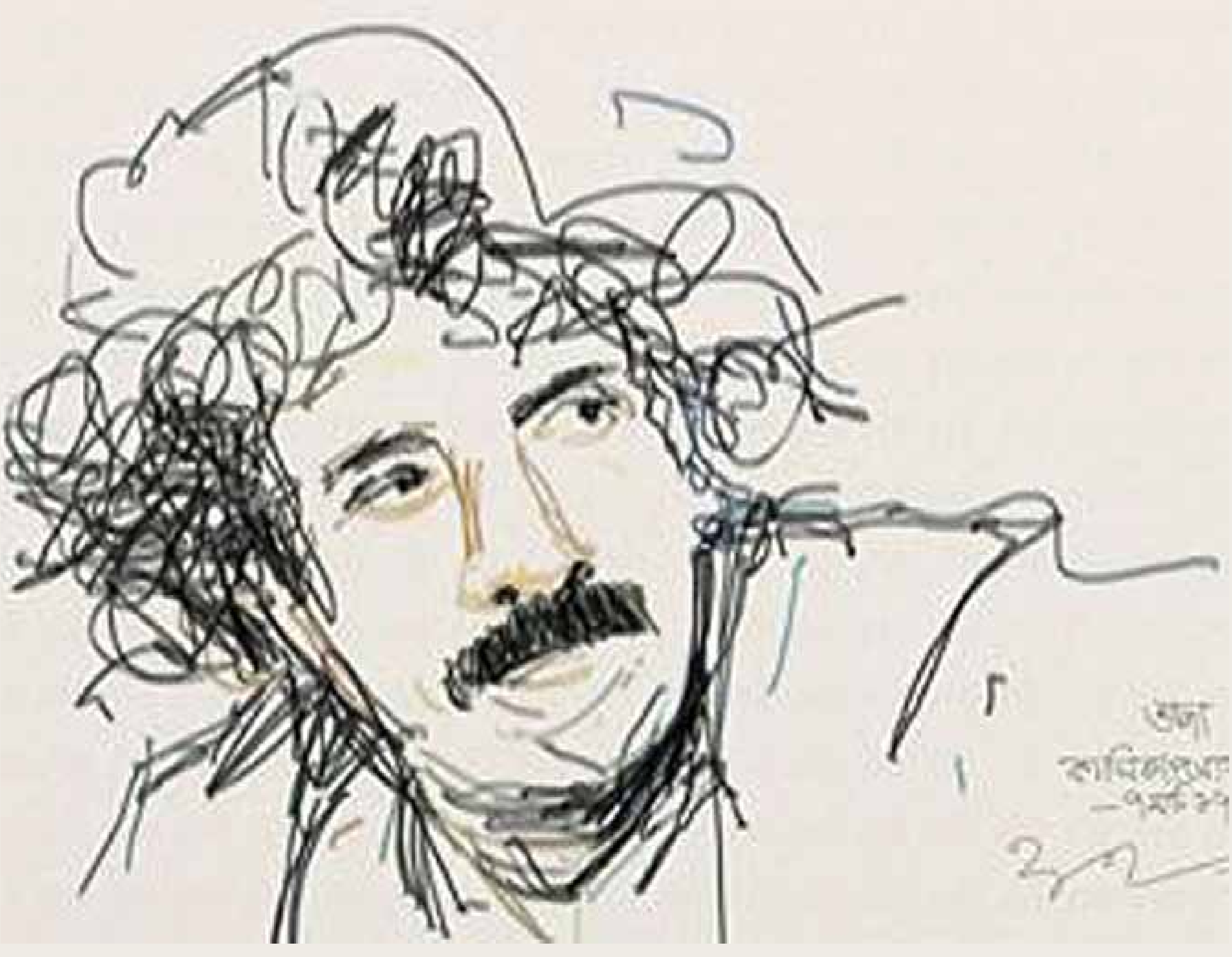

মাত্র ১৭ বছর বয়সে ১৯৮৭ সালে কালিকা শিলচরের গণনাট্য সংঘে যোগ দেন। শিলচরের জি এস কলেজে পড়ার সময় তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। শিলচরে থাকাকালীন তিনি সক্রিয় বামপন্থী আন্দোলনে পুরোধা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কাকা মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য ছিলেন সাংস্কৃতিক অঙ্গনের গুণী ব্যক্তিত্ব এবং গণনাট্য সংঘের অন্যতম সংগঠক। গণনাট্য সংঘের অনুষ্ঠানসমূহে কালিকার উজ্জ্বল উপস্থিতি সবাইকে প্রাণিত করত। গণনাট্য সংঘে তিনি সান্নিধ্য পেয়েছিলেন শুভপ্রসাদ নন্দীমজুমদার, হৃষিকেশ চক্রবর্তী প্রমুখ বিখ্যাত গায়কদের। হৃষিকেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে যৌথভাবে গান লিখে, সুর করে ক্যাসেটও বের করেছিলেন কালিকা। কালিকা খুব ভাল বাজাতে পারতেন, তিনি শুভপ্রসাদের (বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত) সঙ্গে বাদনশিল্পী হিসেবেই যুক্ত ছিলেন। সে-ভাবে গান করতেন না। কাকা মুকুন্দদাসের পরিচালনায় 'গাজন' ইত্যাদি নৃত্যে অংশগ্রহণ করতেন, সে-ভাবে নৃত্যশিল্পীও ছিলেন না। কয়েকটি নাটকেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। গণনাট্য সংঘের সংগীতদলের গুরুত্বপূর্ণ সক্রিয় কর্মী হবার সুবাদে কালিকাকে সবাই চিনত ও পছন্দ করত। শিলচরে তিনি খুবই প্রিয় ছিলেন। পারিবারিক এবং তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিভা ও ব্যবহারে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সুখ্যাতির পরবর্তী অধ্যায়ের সূচনা কলকাতায়।

কলকাতায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে সম্মানের সঙ্গে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিলাভ করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়েও বামপন্থী রাজনীতিতে যোগ দেন এবং সেই সুবাদে গানে অংশগ্রহণ করতেন।

কালিকার সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে গৌড়ীয় নৃত্যের সুবাদে। পটভূমিকাটা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। ১৯৯৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের *লোকশ্রুতি* পত্রিকায় গৌড়ীয় নৃত্যের ওপর আমার একটি প্রবন্ধ বেরোয়। সেই লেখাটি কলিকার কাকা প্রখ্যাত নৃত্যচার্য মুকুন্দদাস ভট্টাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমি অবশ্য তখন তাঁকে চিনতাম না। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিকের কাছ থেকে আমার ঠিকানা ও দূরভাষ নম্বর যোগাড় করে আমাকে একটি চিঠি লেখেন ১৯৯৬ সালে। সেই থেকে ওঁর সঙ্গে আমার পত্রযোগাযোগ শুরু হয়। তিনি জানালেন ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে শিলচরে কালিকার বাবা প্রয়াত রামচন্দ্র ভট্টাচার্যের নামে নৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন তিনদিনব্যাপী।

সেখানে যদি নৃত্যের এবং গানের বিচারক হিসেবে আমি ও আমার স্বামী গৌড়ীয় সংগীত গবেষক অমিতাভ উপস্থিত হই এবং শেষদিন মঞ্চে গৌড়ীয় নৃত্য পরিবেশন করি তবে খুবই ভাল হয়। সেইসঙ্গে যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার যাতায়াতের ব্যাপারে সহায়তা করেন, তবে তাঁরা কৃতজ্ঞ থাকবেন। আমাকে উনি জানান যে, রামচন্দ্র ভট্টাচার্যের পুত্র কলকাতায় থাকেন, তিনি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। কালিকা আমন্ত্রণপত্র নিয়ে আমাদের বাড়ি এলেন। সময়টা সম্ভবত ১৯৯৬-এর শেষ কিংবা ১৯৯৭-র জানুয়ারির প্রথম দিক। অনুষ্ঠানটা ছিল ১৯৯৭-এর জানুয়ারি মাসের সম্ভবত ২৯, ৩০ ও ৩১। সেই প্রথম কালিকার সঙ্গে আলাপ। ২৬ বছরের প্রাণবন্ত যুবক, কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া চুল– সদা হাস্যময়। ওর সঙ্গে আমি আর অমিতাভ প্রথম গেলাম রাইটার্স বিল্ডিংয়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতি সচিব শ্রী সুজিতশংকর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে যদি সরকার গৌড়ীয় নৃত্যকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে শিলচর পাঠান। সুজিতবাবু এর আগে আমার গৌড়ীয় নৃত্য দেখেছিলেন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের জাতীয় সমাবর্তনে, তাই তিনি চিনতেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য সংগীত অ্যাকাডেমির সদস্য সচিবের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি অবহিত করতে বললেন, তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন। আমরা তিনজন রাজ্য সংগীত অ্যাকাডেমির তৎকালীন সদস্য সচিব শ্রী মানস মজুমদারের সঙ্গে দেখা করলাম, বললাম সচিব পাঠিয়েছেন। মানসবাবু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হাঁটিয়ে দিলেন বললেন– 'না না আমাদের টাকা নেই।'

কালিকাতো শুনে অবাক! বাচ্চা ছেলে, বলল– 'সেকি সচিব বললেন করা যাবে আর আপনি বলছেন যাবে না!' আমরা আবার ফোন করে সচিবের দ্বারস্থ হলাম। সচিব শুনে প্রচণ্ড খেপে গিয়ে আমাদের আবেদনপত্রের ওপর কড়া করে সরকার সহায়তা প্রদান করবে বলে লিখে দিলেন। আমরা এসে রাজ্য সংগীতে জমা দিলাম– মানসবাবু সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে করে দিলেন। এই কয়েকদিনের যাতায়াতে কলিকার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেল। এত মিষ্টি ব্যবহার আর ও যখন জানল যে আমিও শ্রীহট্টি মানে সিলেটী তখন ওর খুশি দেখে কে! আমরা সম্ভবত ২৮ জানুয়ারি তিনজন একসঙ্গে শিলচর যাওয়ার প্লেনে চাপলাম। বিমানবন্দরে ও গাড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছিল, তাতে করে আমরা শিলচর শহরে পৌছলাম। সেখানে মুকুন্দদা এক চা-বাগানের ম্যানেজারের বাড়িতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল কালিকার। শিলচরে পৌঁছে দেখলাম কালিকাকে সবাই প্রসাদ বলে ডাকে। শিলচর ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি হলে তিনদিনব্যাপী বিশাল প্রতিযোগিতার আয়োজন। সকাল থেকে সন্ধে অবধি লোকনৃত্য, রবীন্দ্রসংগীতআশ্রিত নৃত্য, মণিপুরী প্রতিযোগিতা হত। প্রসাদ খুব ব্যস্ত– কখনো মাইক নিয়ে ঘোষণা করছে, কখনো নৃত্যের আয়োজন করছে, কখনো বাজিয়েদের সঙ্গে সঙ্গত করছে, কখনো নেপথ্য কোন কাজে ব্যস্ত। দেখলাম মুকুন্দদাসকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করে। আসামের

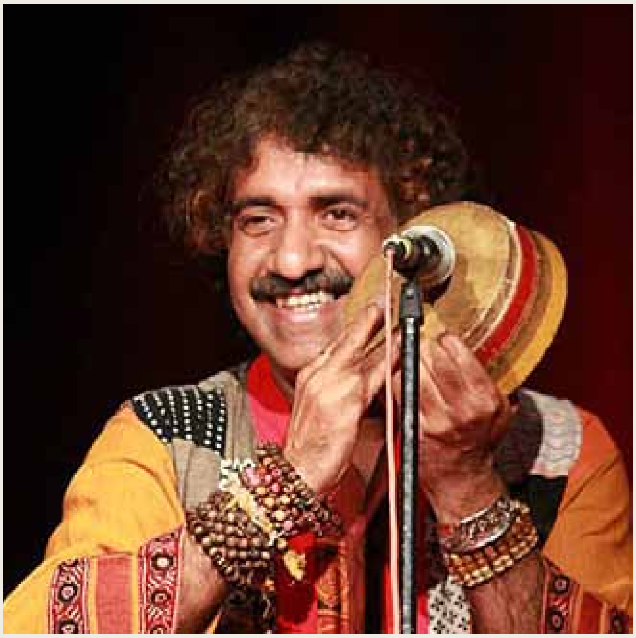

কালিকার হাতেগড়া লোকসংগীতের দল *দোহারে*র শিল্পীদের সঙ্গে

লোকনৃত্যের প্রসিদ্ধ গুরু মুকুন্দদা তখন লক্ষ্ণৌর ভাতখণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। লোকনৃত্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করেন। দীর্ঘদেহী সুঠাম সুপুরুষ এই মানুষটিকে সবাই অসম্ভব মান্য করেন। তিনি প্রসাদের কাকা। গণনাট্য সংঘের সক্রিয় কর্মী প্রসাদকে তিনি অসম্ভব স্নেহ করেন। অত্যন্ত গুণী নৃত্যশিল্পী, নৃত্যগুরু। পরবর্তীকালে উনি কলকাতা এলে সন্তোষপুরে প্রসাদের দিদি ভবানীদির বাড়িতে, আমাদের 'গৌড়ীয় নৃত্যভারতী' নামের শিক্ষায়তনে সিলেটের ধামাইল, বউনাচ, ওঝা নাচ প্রভৃতি শিখিয়ে গেছেন একাধিকবার। আমি ওঁর কাছে প্রশিক্ষণ নিই। শিলচরে ওই অনুষ্ঠানশেষে কালিকা স্থানীয় দোকানে নিয়ে গিয়ে চাদর পছন্দ করতে বলল, কাকা নাকি বলে দিয়েছেন। আমি শেষদিন মঞ্চে গৌড়ীয় নৃত্যের 'দশাবতার' নেচেছিলাম, প্রসাদ দেখে মুগ্ধ। আনুপিসি মানে আনন্দময়ী পিসি, যাঁর কাছে প্রসাদ গান শিখেছিলেন, আমার নাচ

দেখে জড়িয়ে ধরলেন। আর প্রসাদ সম্বন্ধে বললেন যে, আমাদের ভাইপো, আজকে তাঁর বাবার নামে নৃত্য প্রতিযোগিতা হচ্ছে, ওকে কলকাতায় যেন দেখে রাখি। প্রসাদের একবোন আছে, তিনি মুকুন্দদার সঙ্গে নাচ করতেন, ওঝা নাচে অত্যন্ত পটু। আমরা ১ ফেব্রুয়ারি ফিরে এলাম। ১৯৯৭ সালে ডিসেম্বরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত অ্যাকাডেমি আয়োজিত উদয়শঙ্কর নৃত্যোৎসবে মুকুন্দদার তত্ত্বাবধানে 'শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয়'কে কলকাতায় আনতে পেরেছিলাম অনেক লড়াই করে। সেই সময়কার ডান্স গ্রুপ ফেডারেশনের সেক্রেটারি আদিত্য মিত্র সব দায়িত্বে থাকতেন। বাইরে থেকে আসা দলগুলিকে আদিত্য বিভিন্ন হোটেল ও গেস্টহাউসে খুব ভালভাবে রেখেছিলেন। কিন্তু মুকুন্দদার দলকে নিজের স্কুলে ছাদের ঘরে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। কালিকা তো ব্যবস্থা দেখে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। অনেক বুঝিয়ে তাকে মুকুন্দদা নিরস্ত করেন। গিরীশমঞ্চে ওঁদের অনুষ্ঠান দেওয়া হয়েছিল– সেখানে গান ও নাচসহযোগে পরিবেশনা অপূর্ব হয়েছিল। কালিকা সেই সময় মূলত বাজিয়েছিল, তবে গানও করেছিল। কালিকার বোন ও আর দু'জন নৃত্যশিল্পী সরার ওপর ওঝা নাচ পরিবেশন করেছিল। সেই দেখে নৃত্যশিল্পী দেবযানী চালিহা বলেছিলেন– 'ওমা মহুয়া সরার ওপরে নাচতো Living Tadition দেখছি, যা তোমরা গৌড়ীয় নৃত্যে করো।' আদিত্য সমানেই বিরোধিতা করে গেছেন যার জন্য কালিকা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হতেন, আর মুকুন্দদা শান্ত করতেন। এইভাবে কালিকার সঙ্গে দিন দিন আমাদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে চলে। তখন কালিকা প্রায় প্রতিদিন আমাদের বাড়িতে মানে গৌড়ীয় নৃত্যভারতীতে আসতেন। এরপর সম্ভবত ১৯৯৯ সালের ৭ আগস্ট কালিকা 'দোহার' নামে লোকসংগীতের দল তৈরি করেন। তখন শিলচর থেকে মুকুন্দদা তাঁর ভাইপো সৌমিত্রশেখরকে আমার কাছে গৌড়ীয় নৃত্য শিখতে পাঠিয়েছিলেন। ও দুবার এসে ২/৩ দিন শিখেছিল। সৌমিত্র কালিকার খুব প্রিয় ভাই এবং বন্ধু ছিল। সে তখন কালিকার দোহার দলে গাজন নাচ করেছিল। সেইসময় কালিকা দোহার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় আমাদের এখানে আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল।

২০০০ সালে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী 'গৌড়ীয় নৃত্য'-এর ন্যাশনাল সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেখানে মুকুন্দদা আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন, তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল– 'গৌড়ীয় নৃত্যে ওঝা নৃত্য তথা মনসামঙ্গলের উপাদান।' তখন সঙ্গে সহায়তা করার জন্য কালিকাপ্রসাদ এসেছিলেন– ঢোল-পাকাজ ইত্যাদি বাজিয়েছিলেন। তখন কালিকার একটু খ্যাতি বেড়েছে।

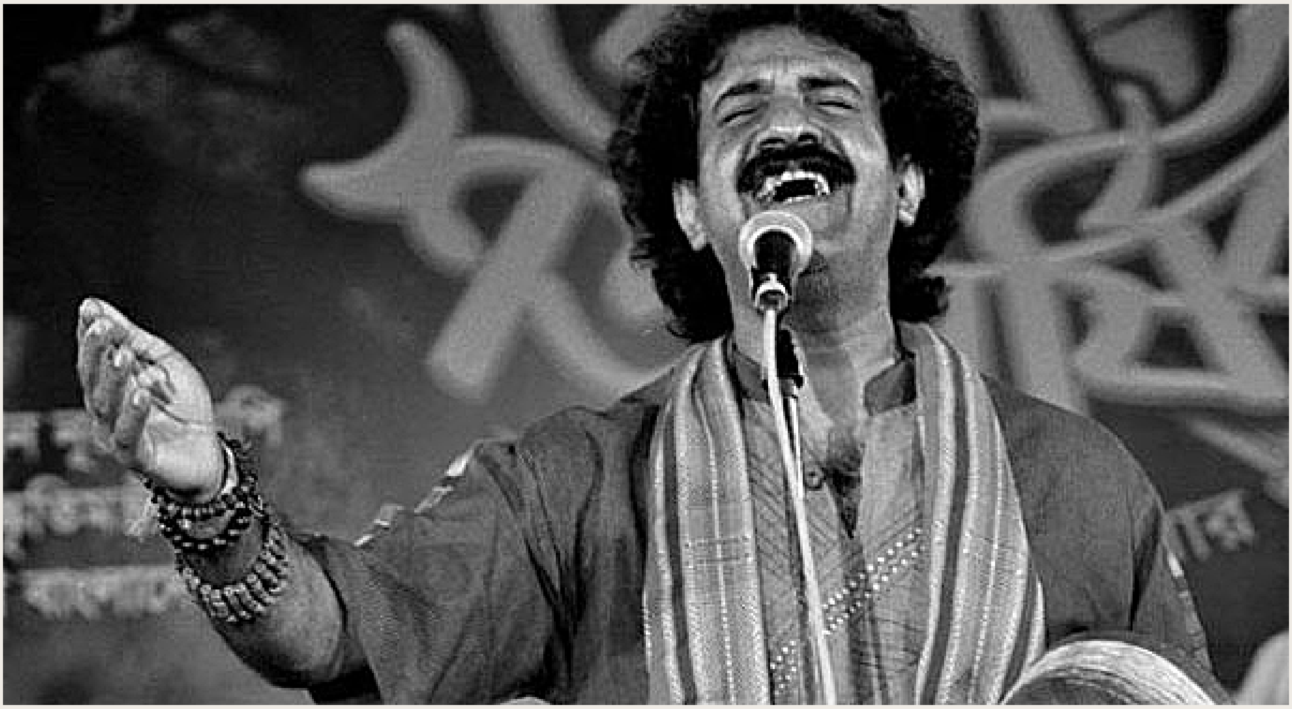

২০০১ সালে মুকুন্দদাকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানাই 'ঈশান বাংলার লোকনৃত্য' বিষয়ে আলোচনার জন্য, সেখানেও কালিকা মুকুন্দদাকে সহযোগিতা করতে এসেছিলেন। আমার মনে আছে, আলোচনা উপস্থাপনা দেখার পর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অর্ঘ্য বলেছিল– 'ম্যাডাম বাংলার এত লোকনৃত্য আছে?' তার আগে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে লোকনৃত্য বলতে খালি বিহু, ভাঙড়া এগুলো করানো হত। কালিকার বাজনা শুনে সব ছাত্রছাত্রী মুগ্ধ। আমি তখন বিভাগীয় প্রধান, এরপরই বাংলার লোকনৃত্যসমূহ পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিই এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একদিন হঠাৎ প্রসাদ ফোন করলেন– 'মহুয়াদি মন্দিরা দিতে পারবেন, দোহারে লাগবে'। তারপর এসে মন্দিরা নিয়ে গেলেন, বেশ কিছুদিন বাদে দিয়েও গেলেন। ইতোমধ্যে কালিকা খুবই বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন, আমাদের আর সেভাবে দেখা-সাক্ষাৎ হয় না, কিন্তু পরস্পর পরস্পরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি, মুকুন্দদা কলকাতা এলে ভাইঝি ভবানীদির বাড়ি ওঠেন আর আমাদের ভাত খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেন। তখন কখনো-সখনো তাঁর সঙ্গে দেখা হত। ইতোমধ্যে ২০০৭ সাল থেকে শিলচরে আমার বছরে একবার করে যাতায়াত বেড়ে গেল। ওখানে মুকুন্দদারই ছাত্র চন্দন জয় প্রভৃতি কয়েকজন গৌড়ীয় নৃত্য শিখতে শুরু করল এবং ওদের স্কুলে শেখাতে বলে। গেলেই মুকুন্দদার কাছে, আনুপিসির কাছে যেতাম। আনুপিসিরা নেমতন্ন করে খাওয়াতেন আর সুন্দর সুন্দর চাদর উপহার দিতেন আসাম অঞ্চলের। কথা প্রসঙ্গে কালিকাপ্রসাদের কথা উঠত– ওঁরা কালিকার গুণে, ব্যবহারে, যশলাভে খুবই খুশি ছিলেন।

২০১০-১১ সালে মুচিবাজারে অনুষ্ঠান করতে গেছি, আমাদের আগে জগন্নাথবাবু-উর্মিমালা বসুর আবৃত্তি ছিল, তারপর আমাদের গৌড়ীয় নৃত্যভারতী ও সবশেষে কালিকাপ্রসাদের পরিচালনায় 'দোহার'-এর লোকসংগীত সবাইকে মাতিয়ে রাখল। আমরা যখন মঞ্চ থেকে নামছি, কালিকার দল মঞ্চে উঠছে, কালিকার সঙ্গে দেখা, বলল, মহুয়াদি অপূর্ব হয়েছে গৌড়ীয় নৃত্যের অনুষ্ঠান। আমরা নামার পরে কিছুক্ষণ 'দোহারে'র অনুষ্ঠান দেখলাম– খুবই ভাল লাগছিল। কিন্তু চলে আসতে হল। ওদের দলের প্রখ্যাত বাদক মৃগনাভির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল। আমরা ওর গুণে মুগ্ধ। এরপর বহুদিনই কালিকার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। গতবছর অর্থাৎ ২০১৬-র মে মাস নাগাদ কালিকা হঠাৎ ফোন করলেন, বললেন, 'মহুয়াদি জি-বাংলার 'হ্যাপি প্যারেন্টস ডে'-তে গৌড়ীয় নৃত্য করতে হবে– কেউ একজন যোগাযোগ করবে। তুমি টাকা-পয়সার কথা বলে নিও। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলবে না, তোমাদের যা দক্ষিণা তাই বলবে।' তারও কিছুদিন আগে একদিন ফোন করে বলেছিলেন 'ঝিলিমিলি'র গ্রান্ড ফিনালের সুটিংয়ে গৌড়ীয় করতে হবে, তারপর বললেন, না ওটাতে না– 'হ্যাপি প্যারেন্টস ডে'-তে করতে হবে। সেই থেকে ওর অকালে চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সা রে গা মা পা-র প্রায় ৫/৬ টা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। এর পেছনে কালিকাপ্রসাদেরই ভূমিকা ছিল প্রধান।

ওর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। সেই গতবছর ফোনে একবার কথা হয়েছিল। কিন্তু বাংলার সংস্কৃতিতে ভালবাসার সূত্রটা আমাদের এক করে রেখেছিল। আমি ২০১৬-র ১৭ জুলাই বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্য বিভাগে রবীন্দ্রচেয়ার অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করি। কিন্তু আমি চলে আসাতে আমাদের গৌড়ীয় নৃত্যভারতীর সা রে গা মা পা-তে অনুষ্ঠান

করায় ছেদ পড়েনি। আমার ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছে বারে বারে এবং তা সম্ভব হয়েছে কালিকাপ্রাসাদের জন্যই। কালিকা আমার ছাত্রীদের পরিচিতি প্রদান করেছেন।

কালিকা যে বাংলাদেশেও এত জনপ্রিয় ওঁর অকাল প্রয়াণের আগে আমি বুঝতে পারিনি। অমোঘ বজ্রের মত ৭ মার্চ বেলা ১১টায় আমার গৌড়ীয় নৃত্যের ছাত্র শান্তনু হোয়াটস্ অ্যাপে জানাল যে কালিকাপ্রাসাদ আর নেই, আমি বিশ্বাস করতে পারিনি, সেইদিন থেকে কান্না শুরু হয়েছে, আজও লিখতে বসে কাঁদছি। এটা শুধু কুড়ি বছর ধরে পারিবারিক পরিচিতির সুবাদে নয়, এটা বাংলাকে– তার শেকড়কে ভালবাসার দৃঢ়বন্ধন। আমি দেখতে চেয়েছি বাংলার হাজার হাজার বছরের প্রাচীন নৃত্যধারাকে, অমিতাভ দেখতে চেয়েছে সেই প্রাচীন শাস্ত্রীয় নৃত্য– গৌড়ীয় নৃত্যের অফুরন্ত সংগীত ভাণ্ডারকে আর লোকসংগীতের ভাণ্ডারী প্রাণোচ্ছ্বল দৃপ্তময় কালিকা দেখতে চেয়েছে দুই বাংলার লোকপরম্পরাগত গানের ধারাকে। সিলেট তাঁর খুব প্রিয় ছিল– তাই সে অনায়াসে বিচরণ করেছে আবদুল করিম শাহ, রাধারমণ, হাছন রাজার গান থেকে ধামাইল, গাজন সবধরনের গানে। সেই দিক দিয়ে আমরা একসূত্রে বাঁধা। আমি সঙ্গে সঙ্গে জানালাম এ-বাংলা এবং সুদূর আমেরিকার হিউস্টোনপ্রবাসী বাংলাকে ভালবাসার এক দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার মৃণাল চৌধুরীকে। তিনি বিশ্ববঙ্গ সম্মেলনের একজন আয়োজক, সেইসময় ঢাকায় ছিলেন। ওঁর সঙ্গে যে কালিকার যোগাযোগ ছিল। উনি শুনেই প্রায় কেঁদে উঠলেন। বললেন, 'সেকি এইতো মাসছয়েক আগে হিউস্টোনে এসে আমাদের সঙ্গে খেয়েদেয়ে গল্প করে গেছে। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণসংযোগ অফিসার ড. সেলু বাসিতের সঙ্গে কথা হওয়াতে আমি জানলাম যে, তিনিও গভীরভাবে কালিকাপ্রসাদকে চিনতেন। সিলেটের অদ্ভুত ভালবাসার সম্পর্ক ছিল তাদের মধ্যে। তিনি জানিয়েছেন কালিকার বিরাট হৃদয় ছিল, তাঁর ভাই চিকিৎসার জন্য যখনই কলকাতা গেছেন, কালিকা শত ব্যস্ততার মধ্যেও সবসময় ডাক্তার দেখানো ইত্যাদি করেছেন। সেলু বাসিত এসএমএস-এ আমায় লিখেছেন– 'দিদি, দুই বাংলাতেই সে ছিল প্রাণের মানুষ। ছিল গানপাগল, লোকগানের সন্ধানে ছিল ব্যাকুল। মনে আছে, ১৭/১৮ বছর আগে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে শাহ করিম কি জীবিত? আমি বলি হ্যাঁ.. ..সে বিস্মিত হয়ে বলল কোন পদকর্তা জীবিত এটা আবিষ্কার। আমি তাঁর সাথে দেখা করব। ঠিকই সে প্রত্যন্ত দোলগ্রামে গিয়ে আবদুল করিমের সাথে সম্ভবত ২০০০ সালে প্রথমবার দেখা করেছিল। সে ছিল মাতৃভূমি ও মাতৃভক্ত।' সুদূর কেরালানিবাসী বাঙালি বাউল– পার্বতী বাউল লিখেছেন– 'ডেনমার্কে বসে খবরটা পেলাম। হলস্টেব্রো শহরে এসেছি। সকালে উঠে মোবাইলের দিকে তাকাতেই পরপর বার্তাগুলো ভেসে উঠল। অবিশ্বাস্য, এ কী করে হয়? এইতো সেদিন দেখা হল, সেই মানুষটা নেই? ১লা মার্চ বিমানবন্দরে বসে ঢুলছিলাম– সিলেটে গান গাইতে যাব।... কালিকাদা! তুমিও ঢাকা যাচ্ছ? কালিকাদা বলল, হ্যাঁ। 'ভুবনমাঝি'-র সিডি প্রকাশ হবে।... বিমান মাটিতে ছোঁওয়ার আগে দেখি ঠিক আমার আসনের পাশে দাঁড়িয়ে– কালিকাদা এরকমই। স্নেহময় আর দায়িত্বশীল। একবার শিলচরে কালিকাদার বাড়ি গেছিলাম, ওদের যৌথ পরিবার। মনে হয় সবাইকে নিয়ে চলার ক্ষমতাটা কালিকাদা সেখান থেকেই পেয়েছিলেন। শিলচরে সংস্কৃতিচর্চায় ওই পরিবারের অবদান একেবারে প্রথম সারিতে। কালিকাদা তাই অন্য সবার থেকে আলাদা।'

কালিকাপ্রসাদের প্রসাদপ্রাপ্ত 'দোহার' এপর্যন্ত মোট আটটি অ্যালবাম এনেছে, যার মধ্যে শেষ অ্যালবাম 'সহস্রদোতারা' ২০১২ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়। *ভোরের কাগজ* পত্রিকায় লিখছে [৮/৩/২০১৭] কালিকাপ্রসাদ ও দোহার ব্যান্ড বাংলাদেশেও দারুণ জনপ্রিয়, বিভিন্ন সময় বাংলাদেশে গান করেছে দলটি। সম্প্রতি বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র *ভুবনমাঝি*র সংগীত পরিকল্পনায় কাজ করেছেন কালিকাপ্রসাদ। চলচ্চিত্রটির প্রিমিয়ার অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ১ মার্চ ঢাকায় এসেছিলেন এই সংগীতকার। অনুষ্ঠানে কালিকাপ্রসাদ বলেছিলেন, 'আমার এখানে দুটো সত্তা। এক হল ভারতবাসী, আরেক হল বাঙালি। মুক্তিযুদ্ধকে আমাদেরও ইতিহাসের অংশ মনে করি।... জন্মগতভাবেও আমি একাত্তরের সন্তান। ১৯৭১ সালেই আমার জন্ম।' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বাংলা গান, বাঙালি সত্তা সবকিছুই তার আপন ছিল।

বাংলাদেশ সময় পত্রিকা লিখছে [৯/৩/২০১৭]– 'আচমকা গাড়িটা রাস্তার পাশে চলে গেল। চাকা খুলে গেল। তারপরে সব অন্ধকার, থেমে গেল অনেক স্বপ্ন। কিন্তু কালিকাপ্রসাদের একটা বড় স্বপ্ন পূরণ হয়েছে ঠিক তিনদিন আগে। স্বপ্ন ছিল চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনা করার। তা পূরণ হয়েছিল বাংলাদেশী সিনেমা *ভুবনমাঝি*-র মাধ্যমে। মার্চ মাসের প্রথম দিন এসেছিলেন ঢাকায়। প্রিমিয়ার শো হয় *ভুবনমাঝি*র, এর মাধ্যমে প্রথম সংগীত পরিচালনা করেছিলেন কোন ছবির। ৩ মার্চ মুক্তি পায় সিনেমাটি। ৭ মার্চ প্রয়াত হন কালিকাপ্রসাদ। ততক্ষণে মুখে মুখে ফিরছে এই ছবির 'আমি তোমারই নাম গাই' গানটি।

*ভুবনমাঝি*তে সপ্তর্ষির কণ্ঠে কালিকা আমাদের শুনিয়েছেন– 'আমি তোমারই নাম গাই। আমার নাম গাও তুমি। আমি আকাশে রোদের দেশে ভেসে ভেসে বেড়াই, মেঘের পাহাড়ে চড়ো তুমি।...' আজ সত্যিই আমরা কলিকার নাম গাই, যিনি রোদের দেশে ভেসে ভেসে মেঘের পাহাড়ে চলে গেছেন, সেখানে বসে গান শুনছেন।

মহুয়া মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্রচেয়ার অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নিবন্ধ

বাংলা কবিতায় নববর্ষ

মো. আল-আমিন

ইংরেজি ষোড়শ শতাব্দীতে মুঘল সম্রাট জালালুদ্দীন মুহাম্মদ আকবরের নির্দেশে রাজস্ব আদায়ের সুবিধা লাভের জন্য হিজরি চান্দ্র সনকে সৌর সনের গণনায় এনে যে নতুন সন প্রবর্তিত হয় সেটাই বাঙলাদেশে বাংলা সন নামে পরিচিত হয়। বাংলা সন বাংলা ভাষার মতই আমাদের একান্ত আপন সন। তাই বাংলা নববর্ষ এলে আমরা এক অন্যরকম আনন্দ অনুভবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি। আমাদের কাব্যে নতুন নতুন মাত্রায়, নতুন নতুন শব্দ চয়নে, নতুন নতুন ছন্দ সম্ভারে বাংলা নববর্ষ এবং বৈশাখ মাস জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বাংলা সাহিত্যের মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'নূতন বৎসর' শীর্ষক চতুর্দশপদী কবিতায় বলেন:

"ভূতরূপ সিন্ধুজলে গড়ায়ে পড়িল/ বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে/ নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল/ আবার আয়ুর পথে। হৃদয় কাননে,/ কত শত আশা লতা শুখায়ে মরিল,/ হায় রে কব তা কারে, কব তা কেমনে।/ কি বিফল হইল!"

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই একটিমাত্র নূতন বৎসর কবিতায় সময়ের গতি এবং জীবনের চলমানতার যে অপূর্ব মেলবন্ধন এবং উত্থান-পতনের নকশা তুলে ধরেছেন তা নিজেকে জানবার চৈতন্য জাগ্রত করে। তারপর মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের গভীর অনুধ্যানমূলক নববর্ষবিষয়ক কবিতার বোধগম্যতা আনবার চেষ্টা কম-বেশি অনেক কবিই করেছেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.) বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঋতুভিত্তিক লেখা লিখেছেন। বৈশাখের বারতা তার কবিতায় সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। একদিকে বৈশাখের ধ্বংসাত্মক রূপ, পাশাপাশি নতুন বছরের আগমন সৃষ্টিকে নতুন রূপে উৎসাহিত করে, এমন সত্য তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তার 'বৈশাখ আবাহন' কবিতায়:

"এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ/ তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে...মুছে যাক সব গ্লানি/ মুছে যাক জরা/ অগ্নিস্নানে দেহে প্রাণে শুচি হোক ধরা..."

রবীন্দ্রনথের 'এসো হে বৈশাখ...' ললিত উচ্চারণে বাংলা নববর্ষ এক নতুন অনুভবে বাংলা কাব্যে স্থান করে নিয়েছে। তাঁর 'বৈশাখ' কবিতায় আমরা বলতে শুনি:

"হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ, ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল, তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল/ কারে দাও ডাক,/ হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ?/...দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ/ তোমার ফুৎকার ক্ষুব্ধ ধূলাসম উড়ুক গগনে/ ভরে দিক নিকুঞ্জের স্খলিত ফুলের গন্ধ সনে/ আকুল আকাশ/ দুঃখ সুখ আশা ও নিরাশ..."

রবীন্দ্রনাথ বৈশাখের প্রচণ্ড তাপদাহের মধ্যে থেকে বৈশাখের রুদ্র, রুক্ষ, ধূসর পিঙ্গল অবয়বের মধ্য থেকে সুখ-দুঃখ ও আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্বকে ধূলাসম উড়ানোর স্বপ্ন দেখেছেন এবং সেইসঙ্গে সর্বত্র ফুলের সুবাস বিলানোর আশা ব্যক্ত করেছেন। জীবনের পরতে পরতে তিনি বৈশাখের ভীষণ রূপের মধ্য থেকে আনন্দের বিজয় ছিনিয়ে আনতে চেয়েছেন। তিনি এই কবিতায় বৈশাখকে দীপ্ত চক্ষু সন্ন্যাসী অভিধায় অভিহিত করেছেন। কবি নিজেই বলেছেন যে, 'বৈশাখ' কবিতার মধ্যে মিশে আছে শান্তিনিকেতনের রুদ্র মধ্যাহ্নের দীপ্তি। কবির এই মধ্যাহ্নের দীপ্তি উক্তিতে এক চমৎকার তাত্ত্বিক জীবনবোধ সঞ্চারিত করে যা নববর্ষের আলোকপ্রদ, শান্তিপ্রদ, সমৃদ্ধিপ্রদ আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটায়। ১৩১৭ সালের চৈত্র সংক্রান্তির উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বর্ষশেষ' ভাষণটি পঠিত হয়। ওই ভাষণে তিনি বলেন: "পুরাতন বর্ষের সূর্য পশ্চিম প্রান্তরের প্রান্তে নিঃশব্দে অস্তমিত হইল। যে কয় বৎসর পৃথিবীতে কাটাইলাম অদ্য তাহারই বিদায় যাত্রার নিঃশব্দ পদধ্বনি এই নির্বাণলোকে আকাশের মধ্যে যেন অনুভব করিতেছি। যে অজ্ঞাত সমুদ্রগামী পক্ষীর মতো কোথায় চলিয়া গেল তাহার আর কোন চিহ্ন নেই। হে চিরদিনের চিরন্তর, অতীত জীবনকে এই যে আজ বিদায় দিতেছি, এই বিদায়কে তুমি সার্থক কর, আশ্বাস দাও যে, যাহা নষ্ট হইল বলিয়া শোক করিতেছি তাহার সকলই যথাকালে তোমার মধ্যে সফল হইতেছে।"

ওই ভাষণ রবীন্দ্রনাথ রচিত বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বর্ষশেষ হয়েছে এভাবে: "ঈশানের পুঞ্জ মেঘ/ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে/ বাধা বন্ধন হারা/ গ্রামান্তরে বেণুকুঞ্জে/ নীলাঞ্জনছায়া সঞ্চারিয়া/ হানি দীর্ঘ ধারা।/ বর্ষ হয়ে আসে শেষ,/ দিন হয়ে এল সমাপন,/ চৈত্র অবসান-/ গাহিতে চাহিছে হিয়া/ পুরাতন ক্লান্ত বরষের/ সর্বশেষ গান।"

নববর্ষকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা নানাভাবে উৎসারিত ও নানাদিকে পল্লবিত হয়েছে। তাঁর জীবনের প্রভাতে ও মধ্যাহ্নেও তিনি নববর্ষ উৎসবের সঙ্গে সৃষ্টিশীলরূপে সংযুক্ত থেকেছেন, বর্ষশেষ ও নববর্ষ নিয়ে অজস্র গান-কবিতা-প্রবন্ধ-ভাষণ রচনা করেছেন। ১৮৩৮ সাল। কবিগুরুর বর্ষশেষের চিন্তাটি এরকম হয়ে দাঁড়ায়:

"তোমার বাজনায় মিলেয়ে দাও পুরলোকে,/ ডাকো যা নতুন তাকে,/ বরফের উপর দিয়ে বাজো, আনন্দিত ঘন্টাধ্বনি,/ বছর যাচ্ছে চলে, যেতে দাও তাকে/ তোমার বাজনায় মিলিয়ে দাও মিথ্যাকে, আহ্বান করো সত্যকে।"

রবীন্দ্রনাথের কাছে আনন্দ নিছক বিনোদন মাত্র নয়। আনন্দকে তিনি দেখেন আত্মার অভিব্যক্তিরূপে, আনন্দ তার কাছে সৃষ্টি প্রক্রিয়ারই অপর নাম। সৃষ্টির উৎস, স্থিতি ও বিলয় সবই যে আনন্দময়, সেই ঔপনিষদিক সত্যকে কবিগুরু কখনও ভুলে থাকতে পারেন না। তাই প্রতিটি নববর্ষ ও নব নব সৃষ্টির আনন্দ তাকে উদ্বেল করে তোলে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীলতার স্পর্শ লেগেই বাঙালির অন্তত নাগরিক বাঙালির– নববর্ষ নতুন রূপ ও মাত্রা লাভ করেছে। এখন আমরা, মধ্যবিত্ত বাঙালিরা, শহরে-বন্দরে যেভাবে নববর্ষ পালন করি তা আসলে রবীন্দ্রসৃষ্ট নববর্ষ উৎসবেরই উত্তরাধিকার। ধর্ম প্রবন্ধমালার নববর্ষ প্রবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন,

"প্রান্তরের মধ্যে পুণ্য নিকেতনে নববর্ষের প্রথম নির্মল আলোকের দ্বারা আমাদের অভিষেক হইল। আমাদের নবজীবনের অভিষেক। মানবজীবনের যে মহোচ্চ সিংহাসনে বিশ্ববিধাতা আমাদিগকে বসিতে স্থান

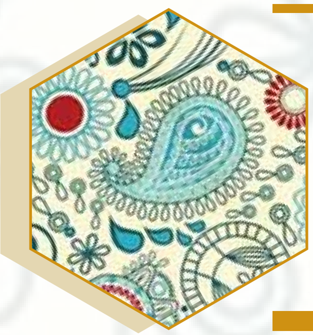

এক অগ্রহায়ণ মাস ছাড়া বাংলা সনের প্রতিটি মাসই এক একটি নক্ষত্রের নামে পরিচিত। বৈশাখের নাম হয়েছে বিশাখা নক্ষত্রের নামে। বৈশাখ আসে নতুন বছরের খবর নিয়ে, কালবৈশাখীর খবর নিয়ে। যার মধ্যে লুকিয়ে থাকে এক তাণ্ডবের অনুভূতি। বাংলা সাহিত্যে তাই ঘুরেফিরে বৈশাখ স্থান করে নিয়েছে এক ঝড়ো নকশা হয়ে। বাংলা নববর্ষ হয়ে উঠেছে এক নবতর তেজোদ্দীপ্ত প্রত্যয়ের প্রতীক।

দিয়াছেন, তাহা আজ আমরা নবগৌরবে অনুভব করিব। আমরা বলিব, হে ব্রহ্মাপণ্ডিত, এই যে অরুণরাগরক্ত নীলাকাশের তলে আমরা জাগ্রত হইলাম আমরা ধন্য। এই যে চিরপুরাতন অন্নপূর্ণা বসুন্ধরাকে আমরা দেখিতেছি আমরা ধন্য।"

রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতন ও ধর্ম' প্রবন্ধমালায় বর্ষশেষ, নববর্ষ প্রভৃতি ভাষণ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই বিশ্বেশ্বর কোন সম্প্রদায়ের ঈশ্বর নন, তিনি মানুষকে বিভক্ত করেন না, মানুষকে তিনি মিলিত করেন নানা উপলক্ষে যেন মানুষ বুঝতে পারে আপনার দৈহিক সীমার বাইরে দাঁড়ানোমাত্র মানুষ একের সঙ্গে অন্যে মিলতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশি' কবিতায় এক সাম্যবাদী সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে। সেখানে বাংলা নববর্ষ প্রবর্তক সম্রাট আকবরের সঙ্গে হরিপদ কেরানি তথা অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের মধ্যে কোন ভেদ নেই। এ কি কবির শুধুই দার্শনিক উপলব্ধি না ভবিষ্যদ্বাণী?

আমরা জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাল বৈশাখীর ঝড় হবার যে আকাঙ্ক্ষার দুর্বার গতি হবার আহ্বান শুনি তা প্রচণ্ড বেগে বিপ্লবের নতুন কেতন উড়াবার শক্তি যুগিয়েছিল এদেশ থেকে উপনিবেশবাদী ব্রিটিশকে উৎখাত করবার অনুপ্রেরণা হয়ে। বৈশাখ এলে, বাংলা নববর্ষ এলে আমরা তেজোদীপ্ত আলোর রোশনাইও হৃদয় গহনে অবলোকন করতে পারি। আমাদের স্বকীয় সত্তার খোঁজ পাই। মূলত বাংলা সন আমাদের ঐতিহ্যেরই অন্যতম উপাদান। হিজরি সনের সৌর রূপ, এই বাংলা সন একান্তভাবে আমাদের নিজস্ব। তাই একে আমরা আগলে রাখতে বাধ্য আমাদের নিজস্বতার কারণে।

কবি গোলাম মোস্তফা 'নববর্ষের আশীর্বাদ' শীর্ষক কবিতায় লিখেছেন:

"ওই এলোরে ওই এলো/ নূতন বরষ ওই এলো!/ তরুণ তপন উঠলো রে/ ধাবন্ত তিমির ছুটলোরে!/... নওরোজের এই উৎসবে/ ওঠ জেগে আজ ওঠ সবে/ সুপ্তি ভাঙ্গো চোখ খোলো/ দুঃখ হতাশ শোক ভোলো/ চাও কেন আর পশ্চাতে?/ চাইলে হবে পসতাতে!/ হও আজিকে অগ্রসর/ নূতন আশায় ব্যগ্রতর..."

মূলত কবি গোলাম মোস্তফা অতীতের দুঃখ-হতাশা-শোক ভুলে নতুন আশা নিয়ে, নতুন বছরে নতুন সুখ-সমৃদ্ধির কামনা নিয়ে এগিয়ে চলবার ডাক দিয়েছেন।

কবি ফররুখ আহ্‌মদের 'বৈশাখ' শীর্ষক কবিতায় বৈশাখকে দেখি এইভাবে:

"বৈশাখ আজ মেঘে সোয়ার তোলে চাবুক,/ বিজলী শিখার চমক হানে সেই পথিক,/ যাই ভুলে মোর কর্মসূচী প্রাত্যহিক;/ ত্রস্ত তবু তৃষার্ত মন সমুৎসুক।" তাঁর 'বৈশাখ' শীর্ষক আরেকটি বিশাল অবয়ববিশিষ্ট কবিতা রয়েছে। বোধকরি এই 'বৈশাখ' কবিতাটি বাংলা কাব্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা হিসেবে গণ্য হতে পারে। এই কবিতায় কবি ফররুখ বলেন: "ধ্বংসের নকীব তুমি হে দুর্বার, দুদুর্ষ বৈশাখ/ সময়ের বালুচরে তোমার কঠোর কণ্ঠে/ শুনি আজ অকুণ্ঠিত প্রলয়ের ডাক।/ চৈত্রের বিশীর্ণ পাতা রেখে গেছে, শেষ চিহ্ন সালতামামীর,/ ফাল্গুনের ফুলদল আজ শুধু কাহিনি স্মৃতির,/ খররৌদ্রে অবসন্ন রাহী মুসাফির যত পথ প্রান্তে নিঃসাড়, নিশ্চল,/ আতশের শিখা হানে সূর্যরশ্মি লেলিহান, ঝিমায় মুমূর্ষু পৃথ্বিতল,/ রোজ হাশরের দগ্ধ তপ্ত তাম্র কাঠ মাঠ, বন মৃত্যুমুখী, নিস্তব্ধ, নির্বাক,/ সুরে ইস্রাফিল কণ্ঠে পদ্মা মেঘনার তীরে/ এস তুমি হে দৃপ্ত বৈশাখ..." তিনি বৈশাখকে বিপ্লবের প্রতীক, জঙ্গী, নির্ভয় প্রভৃতি অভিধায় অভিহিত করেছেন যেমন, তেমনি আপসহীন এক সংগ্রামী সত্তা হিসেবে বৈশাখকে দেখেছেন। কবি বলেন: "সংগ্রামী তোমার সত্তা অদম্য, অনমনীয়– বজ্রদৃঢ় প্রত্যয় তোমার,/ তীব্র সংঘর্ষের মুখে বিশাল সৃষ্টিকে ভেঙ্গে অনায়াসে কর একাকার/ সম্পূর্ণ আপোষহীন, মধ্যপথে কোনদিন থামে না তো, জানে না বিরতি,/ তোমার অস্তিত্ব আনে ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে অবিচ্ছিন্ন, অব্যাহত গতি,/প্রচণ্ড সে গতিবেগ ভাঙ্গে বস্তি, বালাখানা, ভেঙ্গে পড়ে জামশিদের জাঁক,/ লাভ-ক্ষতি সংজ্ঞাহীন, নিঃশঙ্ক, নিঃসঙ্গ তুমি/ হে দুর্বার, দুর্জয় বৈশাখ..."

বাংলা নববর্ষ বাংলা সাহিত্যে নানাভাবে ঠাঁই করে নিয়েছে। কবি কায়কোবাদ, কাজী কাদের নওয়াজ, আজিজুর রহমান, বন্দে আলী মিয়া, শাহাদাৎ হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, আবদুর রশিদ খান, আবদুস সাত্তার, আল মাহমুদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, ফজল-এ-খোদা, শামসুল ইসলাম, রেজাউদ্দিন স্টালিনসহ আরো অনেক কবি ও ছড়াকার বাংলা নববর্ষ ও বৈশাখ নিয়ে লিখেছেন। সৈয়দ শামসুল হকের বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা এক ভিন্নতা এনেছে বাংলা কাব্য সাহিত্যে।

জীবনানন্দ দাশ 'ঘুমায়ে পড়িব আমি' শীর্ষক কবিতায় লিখেছেন:

"ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে/ শিয়রে বৈশাখ মেঘ সাদা সাদা যেন শঙ্খের পাহাড়..."

সৈয়দ শামসুল হুদা বৈশাখকে দেখেছেন নিজেকে চিনবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। তিনি বলেন:

"আমি কে/ আমি পারিনি চিনিতে আজ/ কি অবাক কি অবাক/ পুরোনো আমাকে নতুন নতুনে/ সাজিয়েছে বৈশাখ/ দু'চোখে আমার নতুন নীলিমা/ নতুন পৃথিবী ডাকে/ দেখি বারবার উৎসব দিনে/ বাংলার বাংলাকে।"

বাংলা কাব্য আঙিনায় কবি বেনজীর আহমাদ এক বিপ্লবী চেতনাসমৃদ্ধ কবিসত্তা। বৈশাখকে নিয়ে তিনি বিপ্লবাত্মক মননশীল কবিতা রচনা করেছেন। বিদায়ী বছরকে অতীত মনে করে আগামী নতুনের স্বপ্নে বিভোর হয়েছেন, বৈশাখী ঝড়ের মত সম্মুখপানে অগ্রসর হবার আহ্বান জানিয়েছেন। কবি বৈশাখী কবিতায় লিখেছেন:

"ধূসর তোমার ধুম্র জটা ধূমকেতুর ঐ পুচ্ছসম/ দীর্ণ করি জীর্ণ ধরা ঘুরাও বেগে উগ্রতম/ ঘূর্ণিঝড়ের এ ঘূর্ণ তালে/ উড়াও ভয়ের উর্ণজালে/ চূর্ণ করো পূর্ণকালে মৃত্যু ভীরু শান্তিসম/ রুদ্র কেশের চক্র চাহি চাই না দেবী কান্তসম।"

এক অগ্রহায়ণ মাস ছাড়া বাংলা সনের প্রতিটি মাসই এক একটি নক্ষত্রের নামে পরিচিত। বৈশাখের নাম হয়েছে বিশাখা নক্ষত্রের নামে। বৈশাখ আসে নতুন বছরের খবর নিয়ে, কালবৈশাখীর খবর নিয়ে। যার মধ্যে লুকিয়ে থাকে এক তাণ্ডবের অনুভূতি। বাংলা সাহিত্যে তাই ঘুরেফিরে বৈশাখ স্থান করে নিয়েছে এক ঝড়ো নকশা হয়ে। বাংলা নববর্ষ হয়ে উঠেছে এক নবতর তেজোদ্দীপ্ত প্রত্যয়ের প্রতীক।

নববর্ষের অস্তিত্ব আমাদের হৃদয়ে গ্রথিত। সমগ্র অস্তিত্বে বৈশাখ প্রভাব ফেলে। এ প্রভাব থেকে সমাজের কোন স্তরই বাদ পড়ে সবকিছুই উঠে আসে শিল্পীদের বিভিন্ন প্রকার শিল্পের বাঁকে বাঁকে। শিল্পের বিভিন্ন শাখার বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কে লিও টলস্টয় বলেছেন, "মানুষের অর্জিত অভিজ্ঞতা অনুভূত হয়ে যখন বহিঃপ্রকাশের জন্য ক্রিয়াশীল হয়, তখন তা শিল্পে পরিণত হয়। যদি অনুভূতি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ পায় তখন সেটি সাহিত্য।" সম্রাট আকবরের সময় থেকে খাজনা আদায়ের মাস বৈশাখ

থেকে শুরু হলেও বর্তমানে তা পরিবর্তিত হয়ে প্রাণের মেলা ও উৎসবে পরিণত হয়েছে। কবি সাহিত্যিকেরা প্রাণের মেলার এ উৎসবকে শব্দে ধরে রাখতে বার বার প্রয়াসী হয়েছেন।

কবি সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫খ্রি.) বৈশাখকে নতুনের দিগ্বিজয়ী সম্ভাবনা হিসেবে দেখেছেন। পুরাতনকে মুছে ফেলে নতুন উল্লাসে নতুন জীবন শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন। কবি বৈশাখের ভেতর মুক্তির জয়গান যেমন শোনেন, তেমনি রিক্ত হাহাকার বোধও তার প্রাণে জেগে ওঠে। 'বৈশাখ' কবিতায় বলেছেন–

"বর্ষ শেষ দিবসের অশ্রুতে শীর্ণ পাতাগুলি/ স্পর্শ করি বৈশাখের রুক্ষ পথ ধূলি/ ... বর্ষে বর্ষে বৈশাখের নিত্য মত্ত অভিযান/ কে জানে দুর্মূল্য কোন বিস্ময়ের কুণ্ঠিত সন্ধান।"

পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬ খ্রি.) প্রাণের কবি, প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের কবি। অন্তরের সূক্ষ্মতম অনুভূতি প্রকাশে তিনি নিবিড়ভাবে পারদর্শী। তার হাতে বাংলা সাহিত্য কোমলতা, পেলবতার স্বাদ পায়। বৈশাখকে তিনি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এক ধরনের ভালবাসার কোমলতা দিয়ে তিনি নির্মাণ করেছেন বৈশাখকে। 'বোশেখ শেষের মাঠ' কবিতায় বলেছেন:

"বোশেখ শেষে বালুচরের বোরো ধানের ধান/ সোনায় সোনা মিলিয়ে দিয়ে নিয়েছে কেড়ে প্রাণ/ বসন্ত সে বিদায়বেলায় বুকের আঁচলখানি/ গেঁয়ো নদীর দু'পাশ দিয়ে রাখায় গেছে টানি/ চৈত্র দিনের বিধাব চরের সাদা থানের পরে/নতুন বরষ ছড়িয়ে দিলো সবুজ থরে থরে।"

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭ খ্রি.) বৈশাখকে দেখেছেন ভিন্ন মাত্রায়। বৈশাখের আগমনে প্রকৃতি যেমন নব রূপ গ্রহণ করে, তেমনি মানব মনেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগা স্বাভাবিক; তবে সে পরিবর্তন হোক কল্যাণমুখী, সৃষ্টিশীল। মানুষের অস্তিত্ব রক্ষায় এ ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজনীয়। কবি বৈশাখকে প্রকৃতি ও মানুষের নবরূপে জেগে ওঠার অফুরন্ত শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। 'বৈশাখী' কবিতায় তিনি বলেছেন:

"এসো এসো এসো হে নবীন এসো এসো হে বৈশাখ/ এসো আলো এসো হে প্রাণ ডাক কালবৈশাখীর ডাক/ বাতাসে আলো ঝড়ের সুর/ যুক্ত করো নিকট দূর/ যুক্ত করো শতাব্দীতে দিনের প্রতিদানে।"

সাম্প্রতিককালের জাতীয় পত্রিকাগুলোর নববর্ষ সংখ্যা ও সাহিত্য পাতায় নববর্ষ উপলক্ষে রচিত কবিতা ছাপা হয়। নবীন-প্রবীণ কবিরা নববর্ষকে কেন্দ্র করে নতুন করে ভাবেন। আর এ ভাবনাই প্রতিফলিত হয় তাঁদের সাহিত্যকর্মে। কালের নতুন যাত্রাকে স্বাগত জানানোর দিন পহেলা বৈশাখ। ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়নির্বিশেষে পারস্পরিক সম্মিলন ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের দিন। পরস্পরের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি কামনার দিন। উৎসব আর মিলন মেলায় সম্প্রীতি ছড়াবার দিন। সকল ঝড়, ঝঞ্ঝা-ধ্বংসযজ্ঞ ছাড়িয়ে নতুন সৃজনের দিকে যাত্রা, অগ্নিস্নানে শূচি হবার দিন।

মো. আল-আমিন তরুন লেখক

ঘটনাপঞ্জি ❖ মার্চ - এপ্রিল

০১ মার্চ ১৯৩৪	❖	সাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম	০৫ এপ্রিল ১৯৩২	❖	ছোটগল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু
০২ মার্চ ১৯৪৯	❖	স্বাধীনতা সংগ্রামী সরোজিনী নাইডুর মৃত্যু	০৫ এপ্রিল ২০০৭	❖	কথাকার লীলা মজুমদারের মৃত্যু
০৩ মার্চ ১৮৩৯	❖	শিল্পপতি জামশেদজী টাটার জন্ম	০৬ এপ্রিল ১৯৩১	❖	অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের জন্ম
০৫ মার্চ ১৯৩৯	❖	সাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিতের জন্ম	০৯ এপ্রিল ১৮৯৪	❖	সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু
০৯ মার্চ ১৯৮০	❖	সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের মৃত্যু	০৯ এপ্রিল ১৯৫০	❖	আইসিসিআর-এর প্রতিষ্ঠা
১২ মার্চ ১৯৮৮	❖	কথাশিল্পী সমরেশ বসুর মৃত্যু	১০ এপ্রিল ৫৮৯ খ্রি.পূ.	❖	বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তা গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ
১৩ মার্চ ১৯১৫	❖	কথাকার প্রতিভা বসুর জন্ম	১০ এপ্রিল ১৯০১	❖	কবি অমিয় চক্রবর্তীর জন্ম
১৫ মার্চ ১৯০৪	❖	সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের জন্ম	১২ এপ্রিল ৫৯৯ খ্রি.পূ.	❖	জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের জন্ম
১৬ মার্চ ১৮৮০	❖	রস-সাহিত্যিক রাজশেখর বসুর জন্ম	১৪ এপ্রিল ১৮৯১	❖	সংবিধানপ্রণেতা ড. বি আর আম্বেদকরের জন্ম
১৮ মার্চ ১৯১২	❖	সাহিত্যিক বিমল মিত্রের জন্ম	১৫ এপ্রিল ১৮৭৭	❖	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের জন্ম
১৮ মার্চ ১৯৭৪	❖	কবি বুদ্ধদেব বসুর মৃত্যু	১৬ এপ্রিল ১৮৮৫	❖	বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের জন্ম
২৩ মার্চ ১৯৯৫	❖	কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু	১৬ এপ্রিল ১৯৫১	❖	সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের মৃত্যু
২৩ মার্চ ১৯০২	❖	সাহিত্যিক জরাসন্ধ (চারুচন্দ্র চক্রবর্তী)-র জন্ম	১৭ এপ্রিল ১৯৭৫	❖	সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মৃত্যু
২৫ মার্চ ১৯৩৩	❖	সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম	১৭ এপ্রিল ১৯৮৩	❖	সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যালের মৃত্যু
২৯ মার্চ ১৯২৯	❖	উৎপল দত্তের জন্ম	১৮ এপ্রিল ১৮০৯	❖	হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর জন্ম
২৯ মার্চ ১৯২৬	❖	স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তর মৃত্যু	২৩ এপ্রিল ১৯৯২	❖	চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যু
৩০ মার্চ ১৬১৫	❖	শাহ্‌জাহান তনয় দারাশিকোহ্‌র জন্ম	২৬ এপ্রিল ১৯২০	❖	অংকবিদ শ্রীনিবাস রামানুজনের মৃত্যু
৩০ মার্চ ১৮৯৯	❖	সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম	২৬ এপ্রিল ১৯৬০	❖	রস-সাহিত্যিক রাজশেখর বসুর মৃত্যু

ছোটগল্প

অনিকেতন

রবিউল হুসাইন

মধ্যরাতের আকাশ দেখা যায় রোদে ঝল্‌মল। চারিদিকের শূন্যতা জুড়ে অবিরত জল আকাশ থেকে পড়ছে, অথচ বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। রোদের মধ্যে কেন যে বাতাস বয়ে যায়। সব বাতাস দেখা যায় কেমন অদৃশ্য আবরণে মুগ্ধ। সব অশরীরী কিন্তু অস্তিত্ব শারীরিক অবস্থায়। ও এইসব আবশ্যিক ঘটনাসমূহের তদারকি করছিল।

কোথা থেকে টিয়া পাখি এক তীক্ষ্ণস্বরে ডেকে গেল। গাছের কোটরে কাঠঠোকরাটি ঠক্‌ ঠক্‌ করে ঠোঁট দিয়ে শব্দ করছিল। একটা সাপ পিঁপড়ের ঢিবির উপর দিয়ে চলে গেল। এইসব একটি নাটকের দৃশ্য, তাই ও দেখছিল।

মেয়েরা খুব অসহায় এই পুরুষশাষিত সমাজে ও পরিবারে। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এখনো তারা অত্যাচারিত, প্রতারিত, নিপীড়িত ও নিগৃহীত হয়ে চলেছে। আগে ছিল মাতৃতান্ত্রিক সমাজ, ওরাই সবকিছু পরিচালিত করত। পশুশিকার-অবস্থা থেকে যখন কৃষিব্যবস্থামুখী সমাজ পরিবর্তিত হল, তখন থেকে নারীরা গৃহবন্দিত্বে পড়ল এবং পুরুষশাষিত সমাজে রূপান্তরিত হল।

আজ বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আড়াআড়ি একটা কালো বিড়াল তার পথের এপাশ থেকে ওপাশে পার হল। এই সংকেত নাকি খুব খারাপ আর অমঙ্গলের।

ওর আবার অমঙ্গল! সারাটি জীবন ধরে অমঙ্গলের এক কালো শূন্য কলসি মাথায় নিয়ে চলেছে। ওর তো তাতে কোন অমঙ্গল হয়নি।

কালো রঙের অনেক ব্যাখ্যা। ওকে কালো প্রভাবিত করে না, কখনো করে পেরে ওঠেনি। কালো হচ্ছে শূন্যতার প্রতীক।

আলোহীনতা শূন্যতার ফাঁকা নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতার বোধকে বাড়িয়ে তোলে এবং তাই এর সঙ্গে নিজের অস্তিত্বের অপরিহার্যতা ও আবশ্যকীয়তা সম্বন্ধে সজাগ করে।

ও কোন কিছু বিশ্বাস করে না, শুধু অবিশ্বাসকে ছাড়া। ওকে যখন মেয়েটি বলে ওইখানে দেখা কর বিকেলে, ও সেখানে গেল তার অনেক পরে। গিয়ে দেখল মেয়েটি নেই। ভালই হয়েছে কারণ ও চায় না কেউ তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক করে জড়িয়ে পড়ুক।

মেয়েরা খুব অসহায় এই পুরুষশাষিত সমাজে ও পরিবারে। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এখনো তারা অত্যাচারিত, প্রতারিত, নিপীড়িত ও নিগৃহীত হয়ে চলেছে। আগে ছিল মাতৃতান্ত্রিক সমাজ, ওরাই সবকিছু পরিচালিত করত। পশুশিকার-অবস্থা থেকে যখন কৃষিব্যবস্থামুখী সমাজ পরিবর্তিত হল, তখন থেকে নারীরা গৃহবন্দিত্বে পড়ল এবং পুরুষশাষিত সমাজে রূপান্তরিত হল। তখন পুরুষেরা শারীরীকভাবে– যারা শক্তিধর তারা বাইরের কাজে লিপ্ত হতে থাকল, এর বিপরীতে ঘরে বসে রান্নাবান্না, সন্তান পালন, সংসার দেখা– এইসবে ব্যস্ত হয়ে পড়ল নারীরা। কিন্তু এই নারীকুলই যাবতীয় শিল্প-সাহিত্য-সংগীত কৃষি, বয়ন, বৃক্ষরোপণ স্থাপত্য– সবকিছুর প্রথম উদ্ভাবক। এমনকি চিকিৎসা, খেলাধূলা, ধর্মীয় আচার-বিচারও। তাদের মাধ্যমেই প্রথম বারের মত মানবসমাজে পশুপালন, মানবিক ব্যবহার, যোগাযোগ, সংযোগ– এইসব জেগে ওঠে। সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী শক্তি, কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, কল্পনা, অনুসন্ধিৎসা, আবিষ্কার তাদের মধ্যেই প্রথম ঘটে। তাই ও প্রত্যেক নারীকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে।

তবে একবার এক মেয়ের হাতে এমন জোরে থাপ্পড় খেয়েছিল যে, সে কথা মনে করে ওর খুব গর্ব বোধ হয়। গালে হাত বুলাতে বুলাতে মেয়েটিকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। বলেছিল, আপনার আত্মসম্মান বোধকে আমি সমীহ করি। খট্মট্ করে তাকিয়ে তখন মেয়েটি বলে, তোর লজ্জা লাগে না, বেশ্যাবাড়ির কোন এক মাগীর কাছে গেলিই তো পারিস্ হারামজাদা, ইতর কোথাকার!

আসলে মেয়েটির উদ্ধত স্তন দেখে লোভ আর সংবরণ করতে পারেনি। ভিড়ের মধ্যে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেছিল। ও জানে খুব অশালীন আর অন্যায় তার এই আচরণ। খুব ভাগ্য ভাল মেয়েটি অন্য পথচারীদের ব্যাপারটি জানায়নি। হৈচৈ করে জানালে ওদের পিটুনি খেয়ে ও নির্ঘাৎ অক্কা পেত। বোধহয় সেইজন্যই ও মেয়েটিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছিল।

ও সব মেয়েদের ব্রাহ্মণ বলে মনে করে। কেন-না সব মেয়েই খুব মন দিয়ে ব্রা বাঁধে। আলিঙ্গন শব্দটিকে ওর কাছে খুব অশ্লীল বলে মনে হয়। এটাকে তার শব্দ দ্বারা লিঙ্গ দিয়ে জড়িয়ে ধরা বলে মনে হয়।

ও শেষ পর্যন্ত মনে করে জীবনটাই সময়ের একটা অদৃশ্য কৌটো। ছিপিবদ্ধ করে ওর কোন মতামত না নিয়ে বা দায়বদ্ধতার বিষয়গুলো ব্যতিরেকে অন্ধকারে ছুঁড়ে ও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ও একটি নক্ষত্র। শূন্য-বিরানে ঘুরে ঘুরে চলেছে। নক্ষত্রের যেমন নিজে নিজে জ্বলে যাওয়ার ক্ষমতা আছে আমৃত্যু, ওর অস্তিত্বও তাই। জীবন নামক সূর্যের চারিদিকে সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা, গভীর রাত্রি, প্রভাত– এইভাবেই জীবনের সামান্যমাত্র পথ, অন্ধকার-পরিক্রমা।

ওর সঙ্গে তখন হঠাৎ করে কারো দেখা হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে কথা বলল। আরে তুমি, কেমন আছ! আমি কখনো ভাল থাকি না, তুমি!

আমি খুব ভাল আছি, মানে ঘুম, খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম, জলত্যাগ, মলত্যাগ, বীর্যত্যাগ সব সুন্দরভাবে চলছে।

বাঃ বেশ তো, তুমি আগের মতই আছ।

হ্যাঁ ভাই।

তার মানে তোমার অর্থ কাম সম্পত্তিভাগ্য, ক্ষমতাভাগ্য এখনো ঘটেনি।

মানে!

মানে কিছুই না, কারণ ওসব না হলে কারোর জীবনে পরিবর্তন আসে না।

হঠাৎ করে এক রিক্‌শাওয়ালা তখন ওর গায়ে রিক্‌শার সামনের চাকা উঠিয়ে দিল। ও আস্তে করে বলে ওঠে, ভাই আমার মা নেই, বাপ নেই, বউ নেই, আমাকে এভাবে মারলেন?

ওর বন্ধু হেসে ওঠে। তারপর বলে, দোস্ত যাই, বহুদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হল, আবার দেখা হবে, কথা হবে।

বন্ধুটি চলে যায়, কিন্তু সে যে কে, মনে করতে পারে না। ও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

রাস্তায় জমাটি ভিড়, যাকে বলে যান-জমাট, যান-জট নয়। আজকে কী বার? শনি, রবি নাকি শুক্র। আজ কত তারিখ? ২, ১০ না ১৭। এটা কী মাস? অগ্রহায়ণ না চৈত্র। ও কিছুই জানে না। পথ চলতে থাকে। পথের শেষ নেই, ওর চলারও শেষ নেই, ও চলছে তো চলছেই।

সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে কোন প্রতীকী, কোন বাস্তব বস্তুর বিকল্প নয় বরং তার নিজের ক্ষমতায় সত্য হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়, সত্তা ব্যতিরেকে এটি তার প্রতিনিধিত্ব করছে প্রতীকী হিসেবে, যা বাস্তবতাটির আর একটি নয় বরং ও নিজের অধিকার নিয়েই যে সত্যিকারের আমিকে বাঁচিয়ে তুলেছে, সারাৎসার বা আদি মৌল বিষয়টির গুণাবলি ছাড়া।

এ কারণে ও যে কি, তা সে নিজেও জানে না, জানতে চেষ্টাও করে না। সব সময় সে ছাড়া ছাড়া থাকতে চায়। কারো সঙ্গে বা কারো সম্পর্কে জড়াতে চায় না। গাছের পাতার মত। সূর্যের আলোতে গাছের জীবনের অপরিহার্যতায় সালোকসংশ্লেষণের প্রয়োজন মেটায়, পরে কাজ শেষ হলে প্রয়োজনীয়তা ফুরালে ঝরে পড়ে মাটির উপরে।

তখন দেখে, কে যেন ওই চারতলা দালান থেকে কাকে ডাকছে। ছোট্ট মেয়েটি বোধহয়। কী ব্যাপার! এই যে শোন তোমরা, কাকু গো ও কাকু, আব্বা-আম্মা আমাকে ঘরে বন্দী করে অফিসে গেছে। আমি একা একা ঘরের মধ্যে। বাসায় কেউ নেই, আমি ছাড়া। বল তোমরা, আমার কি রোজ রোজ এরকম করে থাকতে ভাল লাগে? জান আমি একা একা টিভি দেখি, টেবিলে-ঢাকা খাবার খাই আর গলা ছেড়ে কাঁদি। তোমরা আমাকে ছাড়িয়ে নাও, আমি মায়ের কাছে যাব। এই কাকু শুনছ, তুমি শুনছ। ও রাস্তায় দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকায়। দেখে একটা ছোট্ট মেয়ে লাল ফ্রক পরা বারান্দার

রেলিংয়ের ভিতর দিয়ে ছোট্ট দুটো হাত প্রসারিত করে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে পথচারীদের দিকে আকুল ভাবে কেঁদে কেঁদে ডাকছে। আমাকে নিয়ে যাও, আমি মায়ের কাছে যাব, আমি বাবার কাছে যাব।

ও আর সহ্য করতে পারে না। মনে হয় দুদ্দাড় করে এখনি সে চারতলায় উঠে দরজা ভেঙে মেয়েটিকে উদ্ধার করে। কিন্তু সে কিছুই করল না! আস্তে করে নীরবে একজন ভীরু কাপুরুষ হয়ে চোখ নিচে নামিয়ে সামনের রাস্তার উপর দিয়ে যাত্রা শুরু করল এবং অস্ফুট স্বরে নিজে নিজে বলতে থাকে, যা হয় হোক, আমার কী! ওকে উদ্ধার করি আর আমাকে পুলিশ ধরুক আর কি! এসবের মধ্যে নেই আমি!

সেই সময় হঠাৎ করে দু-তিনজন হিজড়া বা বৃহন্নলা বা কিম্পুরুষ বা তৃতীয় লিঙ্গ তাকে ঘিরে ধরে। আজকাল রাস্তায় এদের বেশ দেখা যাচ্ছে। তারা কাছে এসেই, এই কালা বুড়ো, টাকা দে, না হলে তোকে ছাড়ছি না– একথা বলে দুই হাতে শূন্যে তালি ছুঁড়ে হাসাহাসি করে।

ও ভয় না পেয়ে বলে, তোরা দে, আমারই হয় না আবার তোদেরকে দেব।

এ্যা মিনসে বলে কী, তোর নেই তো তোর নেই, তাই বলে আমরা দেব কেন? এ্যা এ যে ভারি সেয়ানা বুড়ো!

এইসব কথা বলে হিজড়েরা হেসে গা ঢলাঢলি করে চলে যায়।

ও বিশেষ একটা গুণ লক্ষ্য করে যে, ওদের মধ্যে কোন ভনিতা নেই। যা ইচ্ছে বা মনে করে তাই বলে ফেলে নিঃসংকোচে। কয়েক মাস আগে রাজনীতির ডামাডোলে আহত এক পুলিশ কর্মকর্তাকে সাহায্য করেছে, দৌড়ে পালানো এক সন্ত্রাসীকে জাপটে ধরে ফেলেছে, সে তার জন্য পুরস্কৃতও হয়েছে। এই অবহেলিত প্রাকৃতিক কারণে জন্ম-নেওয়া জনগোষ্ঠী সবার জন্য, দেশের জন্য জনবলও। তাই তাদের প্রতি মানবিক আচরণ দেখিয়ে ওদের যত্ন করে গড়ে তুলতে হবে। কাগজে দেখা গেল ওদের সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে আত্মনির্ভর করে তোলার কাজে হাত দিয়েছে সরকার, ভোটের অধিকার দেওয়া হচ্ছে, পুলিশে নেওয়া হবে। পাশের দেশের এক বৃহন্নলা লেখাপড়া শিখে শিক্ষকতা করতে করতে কলেজের অধ্যক্ষ পর্যন্ত হয়েছেন। ওদের বিবাহিত জীবন বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ওর মনে হয় হঠাৎ করে ও যেন বৃহন্নলা ভক্ত হয়ে গেল।

মানুষের প্রতি ভালবাসা তার জন্মগত অধিকার, যেহেতু সে মানুষ। প্রত্যেক মানুষের বেলায় বিষয়টি সত্য। সবাই জন্মসূত্রে এই গুণটি জন্মগতভাবে অর্জন করে। পরে অবশ্য নানান পারিপার্শ্বিকতার কারণে সেই মানবিক গুণ অমানবিকতায় রূপ নেয়।

মৌলিকত্বে মানুষ কখনো খারাপ নয়, যদিও সব সময় জীব-জন্তুর, পোকা-মাকড়ের, কীট-পতঙ্গের, পাখ-পাখালির, মাছ-মাছালির, মশা-মাছির সবার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যে বিরাজ করে। যদি কোনভাবে কোন প্রাণীর কোন চারিত্র্য উহ্য থাকে সে মানুষ হতে পারে না, আর মানুষ হিসেবে প্রকৃত মানুষ হলে প্রাণীদের সব বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে থাকতে হবে। তা না হলে জন্মই হবে না, সে মানুষ ছাড়া অন্য এক জীব হিসেবে জন্মলাভ করবে। এটা তার বিশ্বাস।

আর সব কিছুই দৈবাক্রান্ত। এই যে ও পুরুষ হিসেবে জন্মেছে, সে তা নাও হতে পারত, মেয়ে বা বৃহন্নলা হয়েও সে জন্মলাভ করতে পারত। সামান্য দৈব্যক্রমে এদিক-ওদিক হয়েই তার এই পুরুষ অবয়বের অস্তিত্বে আবির্ভাব হয়েছে এবং তার মধ্যে পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া যাবতীয় প্রাণীকুল ও জীবজন্তুর একটু একটু করে সারবস্তুর সারাৎসারের নির্যাস রয়েছে।

প্রকৃতির গবেষণাগারে মানুষ সৃষ্টির যে-প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল, তার সব অসম্পূর্ণ ও অসফল প্রক্রিয়ায় জন্ম হয়েছে মানুষ ব্যতিরেকে যতসব প্রাণীর জগৎ– স্থলে জলে অন্তরীক্ষে ও ভূতলে।

এই কর্মতৎপরতা চলছিল, চলেই যাচ্ছিল মানুষ না হয়ে-ওঠা পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত মানুষের পূর্ণ সৃষ্টিলাভ যে-ই মাত্র সমাধা হল, তখনই সেই সৃষ্টি-প্রকল্প থেমে গেল, আর নতুন প্রাণীর আবির্ভাব ক্রিয়া-প্রক্রিয়া শেষ হল। এর পরে আর নতুন জীবের সৃষ্টি হয়নি, যতদূর জানা যায়। এইভাবে পৃথিবী তার সবকিছু নিয়ে একটি স্থিতিশীলতার ধারাবাহিকতায় চলছে তো চলছেই।

পৃথিবীর জন্য দুটি মাত্র কাল– একটি নিত্য-নতুন মৌল-সৃষ্টির আর একটি ক্রমাগত ধসে যাওয়া, ধ্বংস হয়ে যাওয়া, বিলীনাক্রান্ত হওয়ার

মানুষের প্রতি ভালবাসা তার জন্মগত অধিকার, যেহেতু সে মানুষ। প্রত্যেক মানুষের বেলায় বিষয়টি সত্য। সবাই জন্মসূত্রে এই গুণটি জন্মগতভাবে অর্জন করে। পরে অবশ্য নানান পারিপার্শ্বিকতার কারণে সেই মানবিক গুণ অমানবিকতায় রূপ নেয়।

কাল। ও সেই নষ্ট-ভ্রষ্ট সময়ে কালাতিপাত করছে দৈব্যক্রমে, এ সময়ের আগুপিছুতেও জন্মাতে পারত। কেন পারেনি এর উত্তর জানা নেই তবে সে শূন্যতাকে মান্য করে যেহেতু জীবন বা প্রাণ শূন্যতার পথিকৃৎ প্রতীক। শূন্যতার একটু একটু ভাগ প্রতিটি জীব বুকের মধ্যে নিয়ে অকারণ মৃত্যু অবধি বহন করে চলেছে। ওর জীবন-প্রাণও তাই। ও এখন সেই মহান শূন্যতা লাভ করার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষারত।

সামনে পিছনে কেউ নেই, ও আর অনেক মানুষের ভিড়। ও অনেক ভেবে চিন্তা করেছে, ও ছাড়া ওর আর কেউ নেই। মাঝে মাঝে চিন্তার গণ্ডি থেকে বেশ এগিয়ে যায়। তখনই গোলমাল লাগে।

সেদিন মাঝরাতে রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে চলা শুরু করেছিল। ফাকা পথ। হঠাৎ এক মোটর সাইকেল আরোহী তার শকটটি খুব জোরে থামিয়ে ওর সামনে এসে বলল, চাচা রাস্তা দেখেশুনে চলবেন না? আর একটু হলেই তো!

ও অবাক হয়, রাত দুপুরের ফাঁকা রাস্তাতেও যানজট, অথচ তা নয়, আজব শহর, কোন কাকপক্ষীও নেই। হঠাৎ কোথা থেকে পাতাল ফুঁড়ে মোটর সাইকেল চলে এল। দূরে তার সাইকেলের পেছনের লাল আলো দেখা যায় আর ভট ভট শব্দ।

রাত এখন এমন, পরে এমনটি থাকবে না। সব পরিষ্কার হয়ে দেখা দেবে। আলোময় আর আলোহীনতা– এইসব নিয়েই দিন আর রাত, সুখ আর দুঃখ, আনন্দ আর বেদনা, প্রেম আর প্রেমহীনতা, হাসি আর কান্না, জন্ম আর মৃত্যু।

ও ভেবে ভেবে কোন শেষ পায় না। একা একা পথের বুক চিরে সামনের অজানা গন্তব্যের দিকে চলা শুরু করে, কিন্তু গন্তব্য কোথায়, কতদূরে তা জানে না।

ফুটপাতে মশারি টাঙিয়ে মানুষজন ঘুমিয়ে, পাশে ছেলেমেয়ে নিয়ে মেয়েরা পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে, একপাশে শিশুটির মুখে মায়ের বুক, পুরুষটি একটা ঠ্যাং তার শরীরের উপর উঠিয়ে ঘুমের রাজ্যে।

এখন স্বচ্ছ আকাশ, বৃষ্টি নেই। বৃষ্টি হলে এদের আর কষ্টের সীমা-পরিসীমা থাকে না। দূরে দুইজন পুলিশ বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে বাজিয়ে বাজিয়ে ওর দিকে আসে। জিজ্ঞেস করে, এই তুমি কে?

ও যেতে যেতে বলে, ভাই তা তো আমি জানি না।

এই কী বললে, তুমি কে তুমি জান না, দাঁড়াও তোমাকে জানাচ্ছি।

ও দাঁড়িয়ে যায়। শোনেন ভাই, সত্যি বলছি আমি কে আমি জানি না, বুঝি না। বহুদিন হয়ে গেল আমি আমাকে খুঁজে পাচ্ছি না। আপনারা কী বলতে পারবেন আমি কে, কী আমার পরিচয়, কোথায় আমার বাড়ি, কোথায় আমি থাকি, কীভাবে এখানে এলাম, আমার মা-বাবা কারা, ভাই-বোন কোথায়, পাড়া-পড়ুশি কোথায় থাকে, আচ্ছা, ভাই বলুন না আমি কে। আমাকে উদ্ধার করুন, আমাকে বাঁচান, আমি এই অবস্থার শেষ দেখতে চাই। দরকার হলে আমাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে হাজতে রাখেন, মারেন, মারেন আর মারেন, মেরে কথা আদায় করুন, আমি কে, আমি কে, আমি কে, আমি কে... ...

এক আর একে অনেক অনিকেতন মিলে ওর কথাগুলো রাতের আকাশ কাঁপিয়ে খান খান করে চারিদিকে ভেঙে পড়ে নিঃশব্দে নীরবে।

রবিউল হুসাইন
কবি স্থপতি কথাশিল্পী

বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য ভারত সরকারের স্কলারশিপসমূহ

প্রতি বছর ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ভারত ও বাংলাদেশে পড়ালেখার জন্য বিভিন্ন স্কিমে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বিপুলসংখ্যক স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে। এগুলি নিম্নরূপ:

১. আইসিসিআর স্কলারশিপসমূহ

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্স (আইসিসিআর) ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কোর্স গ্রহণে নিম্নোক্ত স্কলারশিপসমূহ প্রদান করে:

ক. ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম;
খ. বাংলাদেশ স্কলারশিপ স্কিম;
গ. সার্ক স্কলারশিপ স্কিম;
ঘ. কমনওয়েলথ স্কলারশিপ স্কিম; এবং
ঙ. আয়ুষ স্কলারশিপ স্কিম।

ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম

যুব বিশেষত বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষার্থী বিনিময় বৃদ্ধির ভারতীয় প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকা সফরকালে মর্যাদাপূর্ণ ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম ঘোষণা করেন। সেই সূত্রে আইসিসিআর ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে স্কিমটি প্রবর্তন করে। এ বৃত্তির আওতায় শিক্ষার্থীরা মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর/পিএইচ ডি কোর্স (ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিসিন ছাড়া)-এ ভারতে অধ্যয়ন করতে পারেন।

বাংলাদেশ স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর প্রতি বছর প্রকৌশল, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, ব্যবস্থাপনা, ফার্মাসি, চারুকলা ও চিরায়ত ভারতীয় ভাষাসমূহ অধ্যয়নে স্নাতক/স্নাতকোত্তর/এম ফিল/পিএইচ ডি/পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে (মেডিসিন ছাড়া) শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

সার্ক স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর স্নাতক/স্নাতকোত্তর/ এম ফিল/ পিএইচডি (মেডিসিন ছাড়া) কোর্সে স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

কমনওয়েলথ স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর স্নাতক/স্নাতকোত্তর/এম ফিল/পিএইচ ডি/পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে (মেডিসিন ছাড়া) স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

উপরোক্ত ক-ঘ স্কিমগুলির জন্য সাধারণত ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দানের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা আরো তথ্যের জন্য ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন: www.hcidhaka.gov.in

আয়ুষ স্কলারশিপ স্কিম

প্রতি বছর ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ভারতের ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থা যেমন আয়ুর্বেদ, ইউনানি, সিদ্ধ ও হোমিওপ্যাথি কোর্সে অধ্যয়নের জন্য আইসিসিআর-এর এ কোর্সের জন্য স্কলারশিপ নির্বাচন সমন্বয় করে থাকে। স্কিমটি সাধারণত জুলাই মাসে ঘোষণা করা হয়।

ভারতীয় শিক্ষাবৃত্তি ২০১৭-১৮

আবেদনকারীদের বিপুল সাড়া এবং আগ্রহের প্রেক্ষিতে ভারতীয় হাই কমিশন আইসিসিআর শিক্ষা বৃত্তি ২০১৭-২০১৮-এর আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে ০৩ জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

শিক্ষাবৃত্তির জন্য বিস্তারিত তথ্য/দিক নির্দেশনাসহ আবেদনপত্র ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার এই লিঙ্ক http://www.hcidhaka.gov.in/pages.php?id=19741-এ দেওয়া হয়েছিল। প্রার্থীকে এই লিঙ্ক থেকে আবেদন পত্র ডাউনলোড এবং পূরণ (টাইপ করা হতে হবে, হাতে লেখা গ্রহণযোগ্য নয়) করতে বলা হয়েছিল। আবেদনপত্রে ছবি স্ক্যান করে সংযুক্ত করে এবং স্বাক্ষর (হাতে লিখে স্ক্যানকৃত স্বাক্ষর) ও তথ্যাদিসহ আবেদনপত্রটি পিডিএফ ফরম্যাটে তৈরি করে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রসহ নিচে উল্লেখিত যে কোন ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবেদনপত্রসমূহের গ্রহণযোগ্যতা পরিমাপের জন্য এবং পরবর্তীতে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা পরীক্ষার করার জন্য ই- মেইল করতে বলা হয়:

(ক) ভারতীয় হাই কমিশন,ঢাকা: attedu@hcidhaka.gov.in
(খ)সহকারী ভারতীয় হাই কমিশন, চট্টগ্রাম: ahc@colbd.net
(গ) সহকারী ভারতীয় হাই কমিশন, রাজশাহী: ahc.rajshahi@mea.gov.in

যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীদের ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা পরীক্ষা (ইপিটি) অনুষ্ঠিত হয় ১৩ জানুয়ারি ২০১৭।

এবছর ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে রেকর্ডসংখ্যক ১৭২১ জন শিক্ষার্থী ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্স-এর আইসিসিআর স্কলারশিপ ২০১৭-র পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। আবেদনের জন্য বিজ্ঞপ্তি, আবেদনের শেষ সময়, যোগাযোগের পূর্ণ ঠিকানা ইত্যাদি ফেসবুকের এই পেজসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

• বিজ্ঞপ্তি

Coca-Cola
খোলো খুশির জোয়ার!

গান ফিরেছে মাটির কাছে মৃত্যু কেবল মিথ্যে হোক

শ্রীজাত

ফুলের গন্ধ ভাল্লাগে না কাদের বাড়ি সাজায় শোক
গান ফিরেছে মাটির কাছে মৃত্যু কেবল মিথ্যে হোক

পিছু নিচ্ছে হরিধ্বনি তোমার হরি করিম শাহ্
চোখের পাতায় ঘুম নেমেছে হাতের পাতায় অবজ্ঞা
তোমার মধ্যে মাটি ছিল মাটির দোহা মাটির শ্লোক
গান ফিরেছে মাটির কাছে মৃত্যু কেবল মিথ্যে হোক

হাসতে হাসি বেমানানের এই নগরের ফকির সাঁই
সাত সঙ্গত রইল পড়ে ঠাণ্ডা হাতে সাধ মেটাই
চুপের পরে আর কী কথা! ধূপের ধোঁয়া জ্বালায় চোখ
গান ফিরেছে মাটির কাছে মৃত্যু কেবল মিথ্যে হোক

আর ক'টা দিন থাকলে হত চড়ুইভাতির সময় শেষ
দোতারা যায় আকাশপানে সেই যেখানে গানের দেশ
সবাই আগুন পেরিয়ে এলাম সবাই তোমার গানের লোক
গান ফিরেছে মাটির কাছে মৃত্যু কেবল মিথ্যে হোক।

শ্রীজাত ভারতের কবি

কবিতাটি সদ্যপ্রয়াত লোকসংগীত শিল্পী ও গবেষক কালিকা প্রসাদ ভট্টাচার্যের স্মরণে জি বাংলার গানের অনুষ্ঠান 'সা রে গা মা পা'-য় পঠিত হয় –সম্পাদক

উদ্বাস্তু আদিম

নুসরাত নুসিন

সুন্দর দেখেছি। গাছের পাতায় স্থির–
শেকড় গভীরে ছড়িয়ে একমাত্র বৃক্ষই এভাবে চেয়ে থাকতে পারে
চোখের শীতল যাত্রায় উদ্বাস্তু আদিম প্রয়াস।
বাকলে ও অবয়বে কালের প্রাজ্ঞতা বাড়িয়ে তাকে চেয়ে থাকতে দেখেছি
অগ্রবর্তী দিকের বিপরীতে। অথবা মধ্যবর্তী পথের অভিমুখে।
যেখানে চোখ ও মনের অদ্বৈত সম্মেলনে স্থিত হয় কিছু জিজ্ঞাসা ও বিষাদ।
কিছু কর্কশ কালোর যাতনা ও হিমব্যক্ত নিপাট আরাধনা।
প্রতিদানে সে হারায়। অথবা কিছুই হারায় না। কালের ন্যায্যতায় পায়
কিছু ছায়ার প্রসারতা।

আমলকি মেয়ের গল্প

শামীমা চৌধুরী

আমলকি মেয়ের শীর্ণ ডালে শিশির বিন্দু শীতের
রাতভর কুয়াশার নিবিড় চাদরে মুড়ে ছিল মেয়েটি
ভোরে শিশিরের ডাকে ভেঙে গেল ঘুম
ঘুম-ঘুম চোখে আমলকি মেয়ে দেখে নিস্তব্ধ পৃথিবী
পৃথিবীর গায়ে বিষাদের বলিরেখা যেমন
পর্যটন বিধ্বস্ত সমুদ্রসৈকত, তটরেখা জুড়ে
সুনামীর ধ্বংস চিহ্ন!
আমলকি মেয়ে শোনে জল-হাওয়ায়
বদলে যাওয়া প্রকৃতির কান্না
উৎসবের ডামাডোলে প্রাণহীন মানুষের নাচের মুদ্রা,
ভালবাসাহীন ভালবাসা উচ্চারণে মাতাল
হন্তারক যুবকের রক্তাক্ত করতল, সেখানে
ফোটে না সূর্যগোলাপ।

আমলকি মেয়ের ঘুম-ঘুম চোখে আবার সূর্য ওঠে
মুহূর্তেই কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় আকাশ
ঘুমের অতলে যেতে যেতে আমলকি মেয়ে স্বপ্ন দেখে
এবার সে জেগে উঠবে বৈশাখের বজ্রনিনাদে
তখন তার নাম হবে রক্তপলাশ,
ঘুম-ঘুম চোখে মধ্যাহ্ন সূর্যের রোদ উঠবে
ভেসে যাবে নিস্তব্ধ শীর্ণ শীতের সকাল।

জলস্রোতে কালস্রোতে

শাহীন রেজা

যখন বাস থেকে নামলাম ঠিক তখনই
বিশ্রীরকম জলত্যাগের বাসনায় মেতে উঠল আকাশ
স্টেশন ভেঙ্গে চারতলা দালানকে ঢেকে দিয়ে
হুড়মুড় পৃথিবীতে নেমে এল জল– পঙ্গপাল

আমরা ভিজলাম

ফুটপাতে সারি সারি গন্ধমালতি
শুয়ে থাকা ইট পাথর সুরকি আর পলিথিন ব্যাগে
সুরসুর ঢুকে গেল যৌবনবতী
বর্ষণ বালিকারা জলে ভেজা পোশাকে আরও হৃষ্টপুষ্ট
আমরা চশমাহীন চোখে চকমকি পাথর
খুঁজতে লাগলাম

বর্ষণে ইদানীং আলো থাকে না
বজ্র বিদ্যুৎহীন প্লাবনে ভিজে থাকার অর্থ অসুখ-বিসুখ
জলস্রোতে কালস্রোতে ভিজে ভিজে
আমরা আর কত অসুস্থ হব?

চকমকি পাথরের স্বপ্ন, স্বপ্নই থেকে যায়
চারদিকে অঝোর জলত্যাগ
জলস্রোতে কালস্রোতে আমরা দু'জন।

চিঠি

কবির-আল চপল

একদিন কত চিঠি আসত আমার নামে
বাবা পাঠাতেন বিদেশ থেকে
কাকা পাঠাতেন ভারত থেকে।
সাদা খামে, হলুদ খামে, রঙ-বেরঙের খামে
প্রতিনিয়ত চিঠি আসত আমার নামে।
খাকি পোশাক পরে ডাক পিয়ন এসে
দিয়ে যেত সেই সব চিঠি
শোনা যেত পিয়নের গলার আওয়াজ
চিঠি আছে গো চিঠি, দরজা খুলুন
চিঠির মিষ্টি গন্ধে ভরে যেত মন আমার
চিঠি খুলেই সানন্দে পড়তাম
কত মানুষ এসে ভিড় করত আমাদের বাড়ি
চিঠিখানা দেখার জন্য।
দেখতে দেখতে কেটে গেল কয়েকবছর
ফেসবুক, ই-মেইলের এই যুগ এসে
চিঠি আর আসে নাকো আমার নামে
খাকি পোশাক পরে ডাক পিয়ন আর আসে না
আমাদের বাড়ির আঙিনায়
শোনা যায় না তার সেই ডাকাডাকি
চিঠি আসার দিনগুলো আমার কাছে এখন
শুধুই ইতিহাস। আমার নামে আসা চিঠিগুলো আজ
ইতিহাসের দলিল হয়ে সংরক্ষিত হয়েছে
ঘরের আলমারিতে।
সযত্নে সাজিয়ে রেখেছি ওগুলো
জানি, নষ্ট হয়ে গেলে আর কোন দিন
পাওয়া যাবে না মূল্যবান চিঠিগুলো।

জীবনানন্দের প্রতি

রবীন্দ্রনাথ ভৌমিক

জীবনানন্দ, আবার এসো তুমি ফিরে,
ফিরে এসো এই দেশে হৃদয়ের টানে।
তোমার কবিতা আজো কবিদের ভীড়ে–
চেতনায় বারবার প্রেমাঘাত হানে।
শ্যামল খেত বকের সারি গাংচিল,
ধানসিঁড়ি শস্যখেত সবুজের বন
খুঁজিয়া পায় না কবি অন্তরের মিল–
নির্জনে কাঁদে রূপসী বাংলার মন।
আনাচে-কানাচে আলোছায়াঘেরা ঝোঁপে
তোমার কবিতা আজো পড়ে শ্যামা টিয়ে,
শালিক শোনে চড়ুই-বাবুইকে নিয়ে;
আমি তো আমাকে দিয়ে দিয়েছি গো সঁপে।
আজকের রঙমাখানো বালকের ভীড়ে,
প্রকৃতি ও প্রেম নিয়ে আবার এস ফিরে।

আমি যাব

সন্তোষ ঢালী

আমি যাব, যেতেই হবে–
ওই মাটির গন্ধমাখা বাতাসে যেখানে আমার কৈশোর ঘুমায় মাটিচাপা
কবরের মত;
যেখানে চঞ্চল ছেলেবেলা প্রতিদিন এখনও ডাংগুলি খেলে,
এখনও দাঁড়িয়াবান্ধা গোল্লাছুট কানামাছি স্বপ্নের ভেতর উঁকি মারে–
আমার জন্মরক্তের দাগ লেগে আছে যে মাটির আঁচলে– আমাকে ডাকে আদরে
আমি যাব, আমাকে যেতে হবে–
একটু একটু করে শেকড় গেড়ে আঁকড়ে ধরেছি যে মাটি নির্ভরতায়
যে মাটি স্নেহরসে সিক্ত করে চারা গাছটিকে যত্নে করেছে লালন
আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল তার কোলে, আমার ঘুমের বড় প্রয়োজন।
শেকড় ছিন্ন টবের বনসাই আমাকে প্রতিদিন গিলে খায় অসভ্য সভ্যতা
প্রতিদিন ঘানির সর্ষের মত পিষ্ট হই যান্ত্রিক কৌশলে;
হেলেঞ্চার সবুজ অবুঝ লতা আমাকে ডাকে
কচুরির ফুল, ছিকটির ফল, মাছরাঙা, বাবুই আমাকে ডাকে
আমাকে ডাকে ঘুঘুডাকা দুপুর, দোয়েলের শিস্, মৌমাছি, ভাঁটফুলের ঘ্রাণ–
আড়িয়াল খাঁ পদ্মা ধলেশ্বরী পার হয়ে বাতাস এসেছে সমাচার নিয়ে শৈশব থেকে
দেখ, কেমন করে ডাকে! কেমন যাদুর সুরে সিম্ফনি তোলে!
এই বাংলা, বাংলার প্রতিটা বর্ণ আমাকে নাম ধরে ডাকে
আমাকে যেতেই হবে–
আমার মা শুয়ে আছে ওখানে ওই মাটিতে, 'খোকা আয়' বলে ডাকে
আমার পূর্বপুরুষ ঘুমিয়ে কাল-কালান্তর, তারা ডাকে
বিদেহী আত্মার মত আমার প্রতিটা নিঃশ্বাস এখনও মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়
দোল দেয় ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায় সন্ধ্যা ও সকালে
গাবগাছের ডালের ফাঁকে কালো কোকিল এখনও আমাকে ডাকে মধ্যাহ্ন কিংবা
সায়াহ্নে–
প্রতিটা ধূলিকণা কাদামাখা জল রাখালিয়া বাঁশি আমাকে ডাকে
সভ্যতার সমস্ত প্রসাধনী ছাপিয়ে ওই মাটির গন্ধ আমাকে ডাকে,
মাটির মানুষ, ভালবেসে মাটি, মাটিতেই ফিরে যাই মিশে যাই
দোহাই লাগে! যেতে দাও, আমি যাব, যাবই–

পকেটের অহংকার

শিহাব শাহরিয়ার

যারা ঘুমের মধ্যে চোখে সরিষা ফুলের রেণু মাখে, তাদের জমানো বাতাসেরা ভরে দেয় বোয়াম ও বোতল। আমাদের হাতের কব্জিতে ঝোলে দরজার অবশিষ্ট কাঠ; আমরা নদীর ঠোঁটের দিকে তাকাই, তবু জ্বরের তাপ থামে জলপট্টির জলে। এবার আমরা খেয়াল করব মাছেদের আচরণ; বৈশ্বিক বেদনায় যদিও কাতর হচ্ছে ঘরের খুঁটি। একমাত্র সাবানের ফেনাই আমাদের শরীরে শিহরণ জাগায়। চতুর্দিকে চতুর চোরেরা বেঁধেছে সাম্পান; আমরা শুদ্ধ জলের জাগরণ চাই। বংশীবাদকের আচরণ চাই।

তপার্ন

ধারাবাহিক উপন্যাস

ঋতা বসু

তাওয়াং ভ্যালি হোটেল, ১৩ই অক্টোবর
না চাইলেও আমার একটু সকাল সকালই ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের পর্দা সরালেই দেখা যায় তাওয়াং মনাস্ট্রি। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মনাস্ট্রি। তিব্বত থেকে দলাই লামা এসে তৈরি করেছিলেন প্রায় প্রায় চারশো বছর আগে। আমরা ইতিমধ্যে দুবার ঘুরে এসেছি। বেশ লাগে। একটা খেলনা মিউজিয়াম আছে। সর্বসাকুল্যে জিনিস বোধহয় তিরিশটা। বুদ্ধের বিভিন্ন মূর্তি, প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ এইসব। শতদল বলল সক্কালবেলা মনাস্ট্রির দিকে তাকিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে পড়লে যে। চল মর্নিং ওয়াক করে একটু তাওয়াং ভ্যালি হোটেলের কাছ থেকে ঘুরে আসি। প্রবীরের সাড়াশব্দ পেলাম না। ওকে আর ডাকাডাকি না করে আমরা দুজনেই বেরিয়ে পড়লাম।

তাওয়াং শহরের এদিকটা বেশ ঘিঞ্জি, যে কোন একটা মফস্বল শহরের মত। বেশ ধুলো। পশ্চিম হিমালয়ের শান্ত ছবির মত সুন্দর শহরগুলোর মত নয়। সীমান্ত শহর বলে চিনে জিনিসে ভর্তি। আমার হঠাৎ মনে হল– মলয় দত্ত বলে লোকটার সঙ্গে স্মাগলিঙের যোগ ছিল কিনা কে জানে। বর্ডারের শহরগুলো সেদিক দিয়ে ডেঞ্জারাস।

শতদল হাত দিয়ে কাল্পনিক বন্দুক বানিয়ে শূন্যে গুলি ছুড়ে বলল– তাহলে দারুণ হয়। জেমস্ বন্ডের মত ফাটাফাটি লড়াই করব স্মাগলার খুনেদের সঙ্গে।

তাওয়াং ভ্যালি হোটেলটা এখনও ঝিমোচ্ছে। বাইরে উদ্বিগ্ন মুখে বছর পঞ্চাশের এক ভদ্রলোক অস্থির হয়ে পায়চারি করছেন। শতদল এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি এই হোটেলেই উঠেছেন?

– হ্যাঁ কেন বলুন তো? ভদ্রলোক যেন আরও নার্ভাস হয়ে পড়লেন।

– আমাদেরটা সুবিধের নয়। ভাবছি শিফট করব।

এই সময়ে একটা মারুতি ভ্যাস এসে দাঁড়াল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ড্রাইভার বলল– দাশগুপ্তা সাব কওন? দাশগুপ্ত তড়িঘড়ি তার জানালার কাছে গিয়ে কথা বলতে লাগল। বুঝলাম দাশগুপ্ত সাহেব এঁর জন্যই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের দিকে পিছন থাকায় আমরা ওর কথা না শুনতে পেলেও ড্রাইভারের মুখের ভাবটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। দেখার অবশ্য কিছু নেই লেপাপোঁছা পাহাড়ী মুখ। কোন মনোভাবই ফুটে ওঠে না। ভদ্রলোকের প্রতিটি কথার উত্তরেই নির্বিকার না বলাটা শুধু বোঝা যাচ্ছে।

শতদল চাপা গলায় বলল– কি নিয়ে দর কষাকষি করছে বল তো? এরা তো এসেছে ফ্রেন্ডসের সঙ্গে। আলাদা করে কিছু করার প্ল্যান নাকি?

গাড়িটা চলে গেলে পর দাশগুপ্ত তিতিবিরক্ত মুখ করে আমাদের কাছে এসে বললেন– এ কোন জায়গায় এসে পড়লাম মশাই, স্বাধীনভাবে কোন কিছু করার জো নেই।

– কি করতে চান আপনি? শতদল নিরীহ প্রশ্ন করে।

– আমাদের দলের একজন কাল পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে মরেছে। অপঘাত মৃত্যু। আমি আবার এসব একটু মানিটানি। ছেলেপুলের ঘর। গিন্নীকে বললাম– আমাদের টিমটাই অপয়া। আমার আর এক মুহূর্ত থাকার ইচ্ছে নেই। ম্যানেজার বলল যদি নিজে ব্যবস্থা করে চলে যেতে পারেন তো যাবেন। টাকা রিফান্ড হবে না।

একদমে অনেকটা কথা বলে দাশগুপ্ত দম নেবার জন্য একটু থামলেন। টাকা কে চাইছে মশাই? প্রাণ নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পারলে হয়। পুরো ব্যাপারটাই ফিশি। কাল হঠাৎ রাত্রিবেলা খাওয়ার পর ম্যানেজার বলল– তাওয়াং থেকে তিনজন নতুন লোক আসবে দলে। আগে থাকতেই নাকি ঠিক ছিল। এতদিন তো শুনিনি। কাল ওই দুর্ঘটনার পরই শুনলাম। শতদল ভদ্রলোককে থামিয়ে বলল– এবার কিন্তু আপনার রজ্জুতে সর্পভ্রম হচ্ছে দাশগুপ্ত সাহেব। আমরাই সেই তিনজন নিরীহ বাঙালি টুরিস্ট। আসার সময় হেলিকপ্টারে এসেছিলাম। পথের সৌন্দর্য মিস করেছি। বড় দল ছাড়া ফেরাটা একটু মুশকিল আর এক্সপেনসিভ তাই আপনাদের কলকাতা অফিসের সঙ্গে কথা বলে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

– এখন এখান থেকে আর বেরোতে পারবেন না। টেঙ্গায় ধস নেমেছে। রাস্তা সারাই হচ্ছে। কালকের আগে বেরোনো যাবে না।

– ভালই তো। তাওয়াংয়েই রিলাক্স করুন না আর একদিন। হোটেলেই তো আছেন। বাড়তি পয়সাও লাগছে না।

'রিল্যাক্স' শব্দটা দাশগুপ্ত নাক দিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উচ্চারণ করে হোটেলের ভেতরে চলে গেলেন।

আমি বললাম– তুমি হঠাৎ আমাদের কথা বললে কেন? সত্যিই এদের সঙ্গে ফিরবে নাকি?

– ভাবছি।

– তুমি কি সিরিয়াসলি মনে কর ভদ্রলোক খুন হয়েছেন?

– আমার মনে করা না করায় কিছু এসে যায় না। আচমকা কোন কিছু দেখে এরকম হাজার জিনিস আমাদের মনে হয়। সত্যি সত্যি তার কেন ভিত্তি আছে কিনা তার জন্য তো প্রমাণ দরকার। কেউ কোন মামলা রুজু করেনি। তদন্তের ভারও দেয়নি। তাই মনে হল– কালই তো প্রবীর বলেছিল যদি সম্ভব হয় এদের কাছাকাছি থাকলে ইনফর্মালি তদন্তের কাজ খানিকটা এগোতে পারে। তারপর যদি কিছু পাওয়া যায় কলকাতায় গিয়ে প্রবীরের দল বাকিটা করবে। অরুণ দেখছি কাল রাতেই কথা বলে কাজ এগিয়ে রেখেছে।

ফিরবার পথে প্রবীরের সঙ্গে দেখা। এদিকেই আসছিল। বলল– আপনারা কখন উঠে বেরিয়ে পড়েছেন? আমি এদিকে আপনাদের ঘরে নক করছি।

আমি বললাম– তুমি ঘুমকাতুরে লোক, উঠলে কেন এত তাড়াতাড়ি?

– অরুণাচল মানে সূর্যের পাহাড়। সূর্যদেব সবার আগে এখানেই দেখা দেন। শুয়ে থাকার কোন মানে হয়? প্রবীরের চোখেমুখে মুগ্ধতা। পাহাড়গুলো কেমন কাছে চলে এসেছে দেখেছেন? দারুণ জায়গা–

প্রবীরের উচ্ছ্বাসে সাড়া না দিয়ে শতদল অর্থপূর্ণ হেসে চুপ করে রইল। প্রবীর জিজ্ঞেস করল– শতদলদা যেন কি একটা ভাবছেন মনে মনে–

– ভাবছি এইমাত্র একজন এই জায়গাটাকে গাল দিয়ে গেল।

– কে?

– হতে পারে সম্ভাব্য অপরাধীদের মধ্যে কেউ–

প্রবীর হাল্কাভাব ঝেড়ে হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে বলল– সকালবেলাতে অরুণের ফোনেই ঘুম ভাঙল – বলল অপর্ণা দত্তর মেয়েকে খবর দেওয়া হয়েছে। মেয়ে থাকে সিঙ্গাপুরে। ম্যারেড উইথ ওয়ান চাইল্ড।

আমি জিজ্ঞেস করলাম– ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই খুব আপসেট? বেড়াতে এসে আচমকা এইরকম একটা ঘটনা।

– খুব স্বাভাবিক। মনে যাই থাক প্র্যাকটিক্যাল দিকটার কথা চিন্তা করে উনি শান্তভাবেই মেনে নিয়েছেন। দিল্লি ফেরার প্লেনের টিকিট গৌহাটি থেকে। অতএব দলের সঙ্গেই যাবেন গৌহাটি পর্যন্ত। দিবাংয়ে দুরাত ভালুকপংয়ে একরাত কাটিয়ে গৌহাটি থেকে যতদিনে দিল্লি পৌঁছবেন মেয়েও এসে যাবে সিঙ্গাপুর থেকে। সেই মাকে রিসিভ করবে দিল্লি এয়ারপোর্টে। আপাতত এই রকমই ঠিক হয়েছে। আর আপনারাও এদের সঙ্গে যাবেন গৌহাটির আগে ভালুকপং পর্যন্ত।

– বেশ। শতদলকে বেশ সন্তুষ্ট দেখায়। দলের অন্যদের পরিচয় পাওয়া গেল?

ঋতা বসু। জন্ম কলকাতায়। আদি বাড়ি কুমিল্লা। পড়াশোনা শান্তিনিকেতন ও প্রেসিডেন্সি কলেজ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা। প্রিয় বিষয় রহস্য ও ইতিহাস। ছোটদের গল্প ও ছোটগল্প লিখে সাহিত্যের আঙ্গিনায় প্রবেশ। ক্রমশ উপন্যাসেও সমান স্বচ্ছন্দ। তাঁর সৃষ্ট পিন্টুমামা ও বাঘা এই চরিত্র দুটি তাদের রহস্যময় ও মজাদার কর্মকাণ্ডের জন্য পাঠকসমাজে প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য রচিত গোয়েন্দা শতদল একেবারে চারপাশে ঘটে চলা অপরাধ ও অপরাধীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে পাঠককে আবিষ্ট রাখেন শেষমুহূর্ত পর্যন্ত। গল্প উপন্যাস ও রম্যরচনা নিয়ে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা সাত। ছোট-বড় যে-কোন ভ্রমণেই সমান উৎসাহী। চিন জাপানের প্রাচীন ক্যালকুলেশন পদ্ধতি শিখেছেন আগ্রহের সঙ্গে। লেখালেখির সঙ্গে শিশুশিক্ষা ও টিচার্স ট্রেনিংয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন বহু বছর ধরে। ছোটদের এবং বড়দের দু'ধরনের লেখাতেই সমান স্বচ্ছন্দ।

তাওয়াং ভ্যালি হোটেলে একটা সুইটে আমাদের তিনজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বসার ঘরে সোফাগুলোকে এক পাশে সরিয়ে একটা বাড়তি খাট পাতা হয়েছে। পর্দা সরালে অত সুন্দর তাওয়াং মনাস্ট্রি দেখা যাচ্ছে না বলে একটু মন খারাপ হল। তার বদলে দেখলাম পাকদন্ডী বেয়ে রাস্তা নেমে গিয়েছে বাজারের দিকে।

– হ্যাঁ অরুণ খানিকটা বাদে ফাইল নিয়ে আসছে।

শতদল, প্রবীর আর অরুণ তিন কর্মবীর, ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি নিয়ে যখন গভীর আলোচনায় মগ্ন তখন আমি অরুণের আনা ফাইলটা খুলে বসলাম। ফ্রেন্ডসের পর্যটকদলের দশজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। প্রথমেই দেখলাম মৃত মলয় দত্তের নাম। বয়স ৬৬। বিবাহিত। স্ত্রী ও মেয়ের কথা আগেই জানি তাই চোখ বুলিয়ে গেলাম। নর্দান লেদারস– লেদার গুডস এক্সপোর্টের ব্যবসা। দিল্লির গ্রেটার কৈলাসে নিজের ফ্ল্যাট। শারীরিক কোন দুর্বলতা বা রোগ ছিল না।

অপর্ণা দত্ত– বয়স ৬৬। বাঃ বেশ প্রগতিশীল তো। অতদিন আগে সমবয়সী বিয়েটা আজকের মত মুড়ি মুড়কি হয়ে যায়নি। একটু অবাকই হলাম। গৃহবধূ। বয়স সত্ত্বেও চেহারা বেশ আকর্ষণীয়।

ডা. প্রলয় দাশগুপ্ত স্ত্রী মণিকা মেয়ে প্রথমা ও ছেলে প্রত্যয়কে নিয়ে প্রতি বছরই পুজোর সময় বেড়াতে বেরোন। এতদিন গিয়েছেন ট্র্যাভেল ইন্ডিয়ার সঙ্গে। এইবারই প্রথম ফ্রেন্ডসের সঙ্গে। মেয়ের বয়স বারো ও ছেলের বয়স নয়। খুঁতখুঁতে স্বভাব। ফ্রেন্ডসের ব্যবস্থাপনায় ভারি অখুশি। মণিকার নিজস্ব বক্তব্য নেই। স্বামীর সব কথায় সায় দেন।

শায়ক মিত্র– ইঞ্জিনিয়ার। বয়স ৩৫। চাকরি করেন ইন্ডিয়া রিফাইনারিতে। দরকারের বেশি একটি কথাও বলেন না। ওর স্ত্রী বলাকা মিত্র। স্কুলে পড়ান। বয়স তিরিশ। সুন্দরী সপ্রতিভ এবং নিঃসন্তান।

অরিন্দম বাগচী– বয়স বাষট্টি। বিদেশী ব্যাংকে কাজ করতেন। বিপত্নীক। সাধারণত একাই ঘুরে বেড়ান তবে অরুণাচলে একা আসা সম্ভব নয় বলে দলের সঙ্গে এসেছেন।

বেণুগোপাল রামকৃষ্ণণ আয়েঙ্গার– বয়স ৪৩। কলকাতা আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে বন্ধুর সঙ্গে এ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি খুলেছেন পার্টনারশিপে। বাংলায় মাতৃভাষার মতই স্বচ্ছন্দ। ডিভোর্সি। বাবা-মা এবং দু-ভাইয়ের পরিবার তামিলনাড়ুতে থাকে। এক মেয়ে। ঠাকুমা ঠাকুর্দার কাছে কাছে থেকে পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রীয় নৃত্যে তালিম নিচ্ছে। লেক রোডের এই ফ্ল্যাটে আছেন আজ পনেরো বছর। চেন্নাই থেকে আত্মীয়-স্বজন আসে প্রায়ই। ইনিও যান। এ বছর সদ্য সদ্য বাড়ির লোকেরা ঘুরে গিয়েছেন বলে নতুনত্বের খোঁজে ইনি আর দক্ষিণে না গিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন ফ্রেন্ডসের সঙ্গে। পাহাড়ী রাস্তায় পড়ে গিয়ে পায়ের লিগামেন্টে চোট লেগেছে।

এই হল মোটামুটি দশজনের পরিচয়। এর মধ্যে মৃত মলয় দত্ত আর ডা. প্রলয় দাশগুপ্তকে আমরা দেখেছি। প্রবীর বলল– ব্রেকফাস্ট সেরেই চলুন লাগেজ-টাগেজ নিয়ে চলে যাই।

সে উৎসাহে একেবারে টগবগ করছে। আমি প্রবীরকে বললাম– তোমার বিরক্ত লাগছে না ছুটিতে এসে আবার একটা ঝামেলা বাধল বলে। দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম নিজেদের মত। এখন একগাদা লোকের সঙ্গে ওঠবোস করতে হবে।

– ঝামেলা কি বলছেন অভিমন্যুদা, থ্রিলটা ভাবুন। পরতে পরতে রহস্য উন্মোচন হবে। আচমকা পরিচিত নিরীহ চেনা মুখটা বদলে যাবে। আমার তো দারুণ এক্সাইটেড লাগছে।

আমি বললাম শতদল তো নিজেই শিওর নয়। তারপর যদি দেখ পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে নিরীহ মৃত্যু তখন হতাশ হবে তো?

শতদলদা ধোঁয়া যখন দেখেছে আগুন আছেই– আমি শিওর। প্রবীর নিশ্চিন্ত হয়ে বলে।

– তোমাকে দেখে বুঝলাম ঢেঁকি কেন স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে।

শতদল আমাদের কথোপকথন উপভোগ করছিল চুপ করে। প্রবীরের পেছনে লাগার উদ্দেশ্যে বলল– ঠিকই তো এখানে এসেও সেই একই কাজ করে আর তোমার দরকার নেই। তোমার জন্যই এই প্রজেক্ট ড্রপ করা হল।

প্রবীর আশ্চর্য হয়ে বলল– আমার কাজ আর এই কাজ এক হল? রাজনৈতিক খুনোখুনি ছাড়া থাকে ত্রিকোণ প্রেমের প্রতিহিংসা। সে এত মোটা দাগের যে মাথা খাটাবার কোন অবকাশই থাকে না।

– কেন তোমাদের সেই ডাক্তার হত্যা মামলা সে তো বেশ জটিল।

– হ্যাঁ পনেরো বস্তা কাগজ জমেছে। এর মধ্যে রাজনীতির রঙ লেগে গেল আর তদন্তেরও বারোটা বেজে গেল।

অরুণ বলল– প্রবীরের জন্যই শুরু করে দিন চটপট। ওর নেক্সট প্রমোশন কনফার্ম হয়ে যাবে। ছুটিতেও যে পুলিশ কাজ করতে পারে এটা দেখুক সবাই।

তাওয়াং ভ্যালি হোটেলে একটা সুইটে আমাদের তিনজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বসার ঘরে সোফাগুলোকে এক পাশে সরিয়ে একটা বাড়তি খাট পাতা হয়েছে। পর্দা সরালে অত সুন্দর তাওয়াং মনাস্ট্রি দেখা যাচ্ছে না বলে একটু মন খারাপ হল। তার বদলে দেখলাম পাকদন্ডী বেয়ে রাস্তা নেমে গিয়েছে বাজারের দিকে। দুটো পর পর ফোনবুথ। অরুণাচলে মোবাইলের ব্যবহার আশ্চর্য রকমের কম। বিএসএনএলের পোস্ট পেড ছাড়া আর কিছু চলে না। প্রবীরের ফোন থেকে সুবিধেমত ফোন করা যায়। এখানে অবশ্য মলয় দত্তর মৃত্যুর খবর অরুণকে জানানো ছাড়া ফোনের ব্যবহার হচ্ছে না বললেই হয়। প্রবীর নিয়মরক্ষার্থে প্রতিদিন একবার দপ্তরে আর একবার স্ত্রীকে ফোনে কুশলসংবাদ জিজ্ঞেস করে স্বামী ও বাবার কর্তব্য পালন করে। আমার মনে হচ্ছে বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি কতদিন।

দুপুরবেলা খাওয়ার টেবিলে সবার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল ভাল করে। শুধু অপর্ণা আসেননি। ওঁর খাবার ঘরেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। চারটে টেবিলে আমাদের তেরোজনের বসার জায়গা করা হয়েছে। খাবার টেবিলে আচমকা আমাদের তিনজনের উপস্থিতিতে বাকি সবাই যেন একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল। সদ্য ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা, অনিশ্চিত ফেরার পথ– সব মিলিয়ে উৎফুল্ল বোধ করবার মত অবস্থা অবশ্যই নয়। শতদল পরিস্থিতি স্বাভাবিক করবার জন্য প্রথমা ও প্রত্যয়কেই বেছে নিল। তাদের নামধাম ক্লাস হবি এসব নিয়ে কথা শুরু। মণিকা বেশ উৎসাহী মা। প্রত্যয় বলার আগেই সে বলে দিল– আমার ছেলে তবলা শেখে। মাস্টার আসে। নাচ শেখে টিভি দেখে আর ম্যাজিক নিজেই প্র্যাকটিশ করে শিখেছে। তিনটেই খুব ভাল করে।

প্রথমার চেহারা শান্ত। মুখের গঠনে এখন পর্যন্ত কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেনি। সেই তুলনায় তার তিন বছরের ছোট ভাইটি তুখোড়। চোখেমুখে কথা। শতদলকে আস্তে করে বললাম– শিগগিরি একে রিয়েলিটি শোতে দেখতে পাবে।

ফ্রেন্ডস তার রান্নার ঠাকুর ও সঙ্গে চলমান রান্নাঘর নিয়েই ঘুরছে। পর্যটকদের বাইরে খাওয়ালে লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাবে সেইজন্য সব ভাল ট্র্যাভেল এজেন্সিই এই ধরনের ব্যবস্থা রাখে।

আমাদের প্লেটে ভাত পরিবেশন করামাত্রই ডাক্তার বাবু বলে উঠলেন – আবার সেই চাল? তোমাদের বলেছিলাম না ম্যানেজারকে বলবে র‍্যাশন

পাহাড়গুলোর ওপর যেখান থেকে রোদ পড়েছে সেই জায়গাটা একরকম সবুজ। নিচের মাঠঘাট আর এক রকম সবুজ। ছায়ায় ঢাকা জঙ্গলে সবুজের অন্যরকম শেড। কত রকম সবুজ। আকাশ গাঢ় নীল। দূষণহীনতার কারণে এত নীল। নীল সবুজে মাখামাখি হয়ে বুঁদ হয়ে আমরা তিনজনে বসে রইলাম।

দোকানেও এত বাজে চাল দেয় না। ভাতটা মোটা। সামান্য সোঁদা গন্ধও ছড়িয়ে যাচ্ছে ধোঁয়ার সঙ্গে। পরিবেশনকারীর মুখে অপ্রস্তুত ভাব ফুটে উঠল ঠিকই কিন্তু হাত থামল না। প্রবীর চাপাস্বরে বলল– বিচ্ছু নাম্বার ওয়ান। ম্যানেজারের থেকে বখরা পায় ট্যুরিস্টদের গালাগাল শোনার জন্য।

বিস্বাদ ডাল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে ডাক্তার দাশগুপ্ত বললেন– আর যদি আসি ফ্রেন্ডসের সঙ্গে। সবাইকে বারণ করে দেব। ট্র্যাভেল ইন্ডিয়ার সঙ্গে কত জায়গায় গিয়েছি এত খারাপ অভিজ্ঞতা হয়নি। আজ দই দিয়ে যেন মাথা কিনে নিয়েছে। কতটুকু দিয়েছে দেখুন–

দাশগুপ্তের অভিযোগের স্রোতে বাকি সবার মুখের আগল খুলল একটু একটু করে। চেঁচামেচির ফাঁকে অরিন্দম বললেন– ছাড়ুন না। ভাত রুটি নিয়ে বিতণ্ডা করলে আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন না।

বেণুগোপাল প্রতিবাদ করে বলল– বাঃ বাঃ– যার যেটা কাজ সেটা ঠিক মত করা হয় না বলেই তো দেশের এই অবস্থা। এরা আমাদের যতটা সম্ভব আরাম স্বাচ্ছন্দ্য সিকিওরিটি এইসব প্রমিস করেছে বলেই না আমরা এসেছি। ডা. দাশগুপ্ত বললেন– সিকিওরিটির অবস্থা তো দেখলেন সবাই। পাহাড় থেকে পড়ে প্রাণ গেল। আপনার পায়ের এই অবস্থা। ভাগ্যিস আমার কাছে ক্রেপ ব্যান্ডেজ ছিল। এখন সবাই এখানে আটকে আছি। কবে ছাড়া পাব কে জানে?

পরিবেশক ছেলেটি সাদা কাগজের কাপে অন্য সারির লোকেদের দই দিচ্ছিল। বেণুগোপাল তাকে ডেকে বলল– আর এক চামচে ভাত দাও তো ভাই।

শতদল ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করল– আপনার পায়ে লাগল কি করে?

বেনুগোপাল গলা নামিয়ে বলল– আর বলবেন না। ভালুকপংয়ে নদীর ধারটা বড্ড বেশি সুন্দর বলেই বোধহয় সবাই বড় কাজটার জন্য ওই জায়গাটাই বেছে নিয়েছে। সে সব বাঁচিয়ে খাড়াই ধরে নদীর কাছে যেতে গিয়ে এই বিপত্তি।

কেউ না শুনলেও প্রত্যয়ের কানে গিয়েছে কথাগুলো। সে হা হা করে কি একটা বলতে যেতেই তার মা একদলা ভাত তার মুখে ঠেসে দিয়ে বলে– তখন থেকে হাঁ করে বড়দের কথা গিলছ। আজ আর খাওয়া শেষ হবে না।

দাশগুপ্ত বলেন– মা গিলছে দেখেই ছেলে গিলছে। অন্যদিকে মন না দিয়ে ছেলেটাকে খাওয়াও। একেই তো এই ছিরির খাওয়া। এটাও যদি পেটভরে না খায়–

মণিকা গম্ভীর মুখে খাইয়ে যায়। তার দ্রুত হাত চালনার জন্য প্রত্যয় আর দম নিতে পারে না।

বেণুগোপাল খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ছে দেখে পরিবেশক ছেলেটি বলল– দইটা খেলেন না? কত কষ্ট করে যোগাড় করেছি।

– কাল থেকে মিষ্টি দই দিও। নিশ্চয়ই খাব।

শায়ক আর বলাকা কোন আলোচনাতেই অংশগ্রহণ করছে না। পরিবেশের উত্তাপ কমানোর জন্য অরিন্দম বললেন– আজ আলুপোস্তটা খারাপ হয়নি। খেয়ে দেখুন।

উল্টো ফল হল। দাশগুপ্ত মুখটা বিকৃত করে বললেন– এটা আলুপোস্ত? না পোস্ত ফোড়ন দিয়ে আলুর তরকারি।

অরিন্দম আর কথা না বাড়িয়ে শায়কের দিকে মনোযোগী হলেন– কি শায়ক– বলাকার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি?

শায়ক ভদ্রতা রক্ষার্থে একটু শুকনো হেসে বলল– নাঃ আসলে মন-মেজাজ ভাল নেই।

প্রত্যয়ের মাছ বেছে ভাতের গরাসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছিল মণিকা। প্রত্যয় কোন রকমে মায়ের হাত ছাড়িয়ে মুখ তুলে বলল– শায়ককাকু, আমারও মন ভাল নেই।

প্রত্যয়ের বলার ধরনে পরিবেশটা একটু হালকা হল। শায়কের আগে অরিন্দমই প্রশ্ন করলেন– কারণটা কি জানতে পারি লিটল মাস্টার?

– এখানে একদিন বেশি রইলাম বলে আমাদের কাজিরঙ্গা নেবে না।

শায়ক বলল– জানি তো। আর সময়ও হবে না। দিরাংয়ে দু'রাত কাটিয়ে ভালুকপংয়ে একরাত দাঁড়াতেই হবে। আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। এখন কোনরকমে বাড়ি ফিরতে পারলেই বাঁচি।

বলাকা শায়কের দিকে তাকাল। কেমন যেন সে দৃষ্টি। অভিমান, রাগ, ক্ষোভ সব মিশে একাকার।

বেণুগোপাল আমাদের তিনজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন– প্রথম দিন বলে আপনাদের হয়তো খারাপ লাগছে না কিন্তু আর দু-একটা এই রকম স্যাম্পল পেটে পড়লে কিন্তু আপনারাও ফ্রেন্ডসের শত্রু হয়ে উঠবেন।

শতদল হাসল। প্রবীর বলল– আপনি তো চমৎকার বাংলা বলেন। নাম না জানলে আপনাকে সাউথ ইন্ডিয়ান বোঝে কার সাধ্য।

– আর্ট কলেজে পড়তে এসেছিলাম স্কুল পাশ করে। তারপর এখানেই কেটে গেল। মাছ খাওয়া ছাড়া আমি যে কোন বাঙালির থেকে বেশি বাঙালি।

আমাদের খাওয়া প্রায় হয়ে এসেছিল। শায়ক আর বলাকা আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে নিজেদের ঘরে চলে গেল। খাবার ঘরের জানালা দিয়ে বাইরের রোদে ঝলমল লনটা দেখা যাচ্ছে। ভাতঘুমের থেকে অনেক বেশি লোভনীয় হাতছানি।

প্রত্যয় দিদির গলা জড়িয়ে কানে কানে কি বলে দিদির অনুমোদনের অপেক্ষা করছিল। শতদল বলল– আমরাও একটু শুনি কি ব্যাপার।

প্রথমা বলল– ও সন্ধেবেলা আপনাদের ম্যাজিক দেখাবে। এখন সেটা প্র্যাকটিশ করবে। আমাকে ওর এ্যাসিসট্যান্ট হতে বলছে।

পাণ্ডববর্জিত জায়গায় এর থেকে ভাল বিনোদন আর কি হতে পারে।

হোটেলের লনে আমরা বসে আছি। পাহাড়গুলোর ওপর যেখান থেকে রোদ পড়েছে সেই জায়গাটা একরকম সবুজ। নিচের মাঠঘাট আর এক রকম সবুজ। ছায়ায় ঢাকা জঙ্গলে সবুজের অন্যরকম শেড। কত রকম সবুজ। আকাশ গাঢ় নীল। দূষণহীনতার কারণে এত নীল। নীল সবুজে মাখামাখি হয়ে বুঁদ হয়ে আমরা তিনজনে বসে রইলাম। অরিন্দম আর বেণুগোপাল সামনের রাস্তায় হাঁটছেন। বেণুগোপালের হাতে লাঠি। পায়ে ক্রেপ ব্যান্ডেজ। অরিন্দম সব সময়ে বেণুগোপালের সুবিধে-অসুবিধের দিকে নজর রাখছেন। বেণুগোপাল প্রাণপণে হাত নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে তিনি একাই চলতে পারবেন কিন্তু অরিন্দম নাছোড়বান্দা।

প্রবীর বলল– সাউথ ইন্ডিয়ানদের এই লুঙ্গিটা বেশ। তাই না?

আমি বললাম হ্যাঁ। শ্মশানে রাজদ্বারে একই বেশ। একে বলে বেশ্‌টি। আমরা সবাইকেই সাউথ ইন্ডিয়ান বলি– এদের মধ্যে কিন্তু অনেক ভাগ আছে। বেণু যেমন আয়েঙ্গার বলে লম্বা তিলক কেটেছে, আইয়ারে কাটবে উল্টো– হরিজন্টালি।

শতদল বলল– অভিমন্যু চান্স পেয়েই জ্ঞান ঝেড়ে দিল। আমি দেখছি এদের পরস্পরের সঙ্গে ক'দিনেরই-বা পরিচয়– ভ্রমণ শেষে হয়তো আর যোগাযোগও থাকবে না। তবু এই ক্ষণস্থায়ী উদ্বেগ, বন্ধুপ্রীতিই-বা কম কি।

প্রবীর হঠাৎ আমার আর শতদলের হাতে চাপ দিয়ে বলল– এখনই ঘাড় ঘোরাবেন না। ধীরে সুস্থে দেখুন।

আমরা হোটেলের দিকে পেছন ফিরে আর প্রবীর মুখোমুখি বসে আছে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে হোটেলের দিকে ফিরতেই দেখি রিশেপশনে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছেন সেইদিনের ওয়ার মেমোরিয়ালের নীচে স্বামীর জন্য উদ্বিগ্ন মহিলা। হোটেলে কে ফোন করল? ওর মেয়ে নিশ্চয়ই। আমাদের এত সাবধানতার কোন দরকারই ছিল না। উনি এত মনোযোগ দিয়ে কথা বলছেন যে অন্যদিকে তাকানোর অবকাশ নেই।

শতদল জায়গা ছেড়ে ওঠেনি। তার মধ্যেই যা দেখার দেখে নিল। প্রবীর বলল– অপর্ণা দত্ত বেশ শক্ত মহিলা। বিদেশ-বিভুঁইয়ে এইরকম দুর্ঘটনা তার ওপর স্বামী হারানো– দেখে কিন্তু মনে হল বেশ সামলে নিয়েছেন।

– কখন কোন ঘটনায় মানুষের শক্তি সহ্য ধৈর্য্য বেরিয়ে আসে সে নিজেও জানে না। এইখানে অজানা অচেনা পরিবেশ আর মানুষ– কত আর শোক করবেন? ফিরে গিয়ে দৈনন্দিন জীবনে প্রতিপদে যখন স্বামীর অভাব করবেন তখনই আসল শোক।

প্রবীর জিজ্ঞেস করল– আচ্ছা শতদলদা দেখে তো মনে হচ্ছে এখানেই সবার সঙ্গে সবার পরিচয়, তাহলে খুনটা করল কে? বাইরের লোক? শতদল এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। তাকিয়ে দেখি চারপাশের সবুজের রঙ বদলে গাঢ় কালচে হয়ে উঠেছে। মাটি থেকে ঠাণ্ডা উঠে আসছে। আকাশ থেকে বৃষ্টির মত ঝরে পড়ছে শীত। আর বাইরে বসা গেল না। শতদল বলল– এরা চা-টা দেবে না?

বলামাত্রই ম্যানেজারের ডানহাত দীপক ঠিক আলাদীনের দৈত্যর মত মাটি ফুঁড়ে চায়ের ট্রে আর আলুর চপ নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল– আপনারা বাইরে ছিলেন বলে ওখানেই যাচ্ছিলাম। প্রবীর জিজ্ঞেস করল– বাকিরা সব কোথায়? – সবাই ঘরে আছেন। বাগচীবাবু আর বেণুবাবু হাঁটতে বেরিয়েছেন এই কাছেই। এসে পড়বেন এখনই।

দীপক চলে গেলে পর শতদল চপে কামড় দিয়ে চা এক চুমুক খেয়ে মুখ দিয়ে আরামের আওয়াজ করে বলল– প্রাণ জুড়িয়ে গেল। এই ক'দিন অনবরত মোমো থুকপা তিব্বতি চিনে খাবার খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গিয়েছিল। এখন তিনদিন কোয়ালিটি যাই হোক অন্তত কিছু বৈচিত্র্য আসবে।

আমি অধৈর্য হয়ে বললাম– আমরা কি এখানে খেতে এসেছি নাকি? এখনও পর্যন্ত জানাই গেল না এদের মধ্যে কেউ দত্তদের পূর্ব পরিচিত নাকি– একটা দিন চলে গেল। সবার সঙ্গে কথা বলবে কখন?

প্রবীর বলল– আমার ইচ্ছে হচ্ছিল দীপক ছেলেটাকে এখনই একবার বাজিয়ে দেখি। একটু বললে পারতেন।

– বলব বলব। সময় হলেই কথা বলব। সবে তো এলাম। দেখা যাক না আপনিই কিছু কথা বেরিয়ে আসবে।

শতদল হঠাৎ চুপ করে যায়। আধ-খাওয়া চপটাও নামিয়ে রাখে। ভুরু কুঁচকে ওঠে কি যেন ভাবনায়। তারপর আমাদের দু'জনকে উদ্দেশ্য করে বলে– আচ্ছা খুন যেই করুক দলের ভেতরের অথবা বাইরের লোক– তাওয়াংয়ে কেন? এই রকম একটা অড জায়গা। হোয়াই?

শতদল আর আমি দলের অন্যদের সঙ্গে হোটেলের লাউঞ্জে গিয়ে বসলাম। প্রত্যয় আমাদের ঘরে নিজে এসে নেমতন্ন করে গিয়েছে। ডিনারের আগে সে আমাদের মনোরঞ্জনের জন্য বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। শতদলের খুব উৎসাহ। সে বলল– এই অনুষ্ঠান মিস করা একেবারেই উচিত হবে না। এটা সব অর্থেই একক শো। প্রবীর বলল– আপনারা যান। আমি একটু ডিপার্টমেন্টে ফোন করে দেখি কোথায় কি ছড়িয়েছে।

প্রত্যয়ের বাবা যথারীতি অসন্তুষ্ট মুখে বসে আছেন। বেণুগোপাল প্রত্যয়কে টেবিলে নানারকম জিনিস গুছিয়ে রাখতে সাহায্য করছে। শুনলাম সে নাচ-গানের সঙ্গে ম্যাজিকও দেখাবে। অরিন্দমকে উদ্দেশ্য করে ডা. দাশগুপ্ত বললেন– এই যে বাগচীদা আপনি তো ম্যানেজারের সঙ্গে দিব্যি ভাব জমিয়েছেন। আসল কথাটা বলেছেন যে এই কোয়ালিটির ভাত রুটি চা আর খাওয়া যাচ্ছে না?

ডা. দাশগুপ্তর উত্তর দেবার আগেই সিঁড়ি দিয়ে ওর স্ত্রী মণিকাকে নেমে আসতে দেখলাম। সঙ্গে অপর্ণা দত্তকেও নিয়ে আসছে দেখলাম। অপর্ণার চোখে মুখে ক্লান্তি বিষণ্ণতা। তা সত্ত্বেও আমার মনে হল মণিকা খুব ভাল কাজই করেছেন। যত বড় শোকই হোক না কেন বিদেশ-বিভুঁইয়ে একটা ঘরের মধ্যে দিনরাত বন্ধ হয়ে থাকাটা আরও দুর্বিসহ। প্রথমা তার ভাইয়ের তুলনায় লাজুক। সে নার্ভাস হয়ে অনরবত দাঁতে নখ কেটে চলেছে যেন ভাইয়ের ভুলের ওপর তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে। সাজানো হলে পর বেণুগোপাল বললেন– এবার শুরু করে দাও।

– দাঁড়াও শায়ককাকুরা আসেনি।

প্রত্যয় লঘুপায়ে দৌড়াল শায়কদের ঘরের উদ্দেশ্যে। খানিকক্ষণ বাদে ফিরে এসে বলল– আসছে। শুরু করি কেমন? ম্যাজিক হল চোখে শোনা আর কানে দেখা– এই যাঃ সেটা আবার কেমন ম্যাজিক? সেই ম্যাজিকই আজ আপনাদের দেখাবে ম্যাজিশিয়ান প্রত্যয় দাশগুপ্ত। আপনারা সবাই চোখ কান খোলা রাখুন।

আমি মুগ্ধ হয়ে প্রত্যয়ের বাচনভঙ্গী উপভোগ করছিলাম। আজকালকার নাবালকরা কেমন সাবালক হয়ে উঠেছে দেখে মুগ্ধ হতে হয়।

শতদল চাপাস্বরে বলল– শায়ক মিত্র আমাদের দেখে এ্যাবাউট টার্ন করে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

মুগ্ধতা ভেঙে শতদলের কথা বুঝবার চেষ্টা করলাম। বলাকা তো বসে আছে। সবাই বেশ উপভোগ করছে। বেণুগোপাল বোকা সেজে ম্যাজিশিয়ানকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। দু'দিন আগে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার রেশমাত্রও নেই এই আসরে। এমনকি অপর্ণার মুখেও বিষণ্ণতার রেখা খানিকটা হালকা। শুধু শতদলের চাপাস্বরে বলা কথাগুলো আমাকে একটা অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিল। শায়ক মিত্র আমাদের উপস্থিতি পছন্দ করছেন না? উনি কি সন্দেহ করছেন যে আমরা সাধারণ পর্যটক নই?

• আগামী সংখ্যায়

ঋতা বসু ভারতীয় কথাসাহিত্যিক

এক নজরে নাগাল্যান্ড

দেশ	ভারত
অঞ্চল	পূর্ব ভারত
রাজধানী	কোহিমা
জেলা	১১টি
প্রতিষ্ঠা	০১ ডিসেম্বর ১৯৬৩
সরকার	
• শাসকবর্গ	নাগাল্যান্ড সরকার
• রাজ্যপাল	শ্রী পি বি আচারিয়া
• মুখ্যমন্ত্রী	টি আর জেলিয়াং
• আইনসভা	এককক্ষবিশিষ্ট (৬০টি আসন)
• হাইকোর্ট	গৌহাটি হাইকোর্ট (কোহিমা শাখা)
আয়তন	
• মোট	১৬,৫৭৯ বর্গকিমি (৬,৪০১ বর্গমাইল)
• এলাকা ক্রম	ছাব্বিশ
জনসংখ্যা (২০১১)	
• মোট	১,৯৮০,৬০২
• ক্রম	পঁচিশ
• ঘনত্ব	১১৯/বর্গকিমি (৩১০/বর্গমাইল)
সময় অঞ্চল	ভারতীয় প্রমাণ সময় (ইউটিসি+০৫:৩০)
আইএসও ৩১৬৬ কোড IN-NL	
সরকারি ভাষা	ইংরেজি
ওয়েবসাইট	www.nagaland.gov.in

শ্রী পি বি আচারিয়া

টি আর জেলিয়াং

রাজ্য পরিচিতি

নাগাল্যান্ড

নাগাল্যান্ড ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য। এর পশ্চিমে আসাম, দক্ষিণে মণিপুর, উত্তরে অরুণাচল প্রদেশ এবং আসামের কিয়দংশ ও পূর্বে বর্মা। রাজ্যের রাজধানী কোহিমা এবং বৃহত্তম শহর ডিমাপুর। এর ক্ষেত্রফল ১৬,৫৭৯ বর্গ কিমি, লোকসংখ্যা ১৯ লাখ ৮০ হাজার ৬শো ২ জন (২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী)। এটি ভারতের অন্যতম ক্ষুদ্র রাজ্য।

নাগাল্যান্ডে ১৭টি উপজাতির বাস। এগুলি হচ্ছে আও, অঙ্গমি, চাং, কোনিয়াক, লোঠা, সুমি, চাখেসাং, খিয়ামনিউঙ্গম, ডিমাসা কাচারি, ফোম, রেংমা, সাংটাম, ইমচুঙ্গার, কুকি, জেমে-লিয়াংমাই (জেলিয়াং), পোচুরি এবং রংমেই। এসব উপজাতির কিছু শাখা-প্রশাখাও রয়েছে। নিজস্ব প্রথা, ভাষা ও পোশাক-আশাক নিয়ে প্রত্যেকটি উপজাতিই স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত।

রাজ্যের দু'টি জিনিস অভিন্ন– ভাষা ও ধর্ম। সর্বত্র ইংরেজির চল আছে। নাগাল্যান্ড ভারতের ৩টি খ্রিস্টান অধ্যুষিত রাজ্যের একটি। ১৯৬৩ সালে এটি ভারতের ১৬তম রাজ্য হিসেবে পরিগণিত হয়। কৃষিপ্রধান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং প্রধান শস্যের মধ্যে রয়েছে ধান, গম, ভূট্টা, ডাল, তামাক, তেলবীজ, আখ, আলু ও তন্তু। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে আছে বন, পর্যটন, বিমা, আবাসন ও বিভিন্ন প্রকার কুটির শিল্প।

নাগাল্যান্ডের মহাসড়ক

সুমি যোদ্ধাদের স্মরণে সুমি শহীদ দিবস উদ্‌যাপন

বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে রাজ্যে বিদ্রোহ ও আন্তঃজাতিগত সংঘাত চলে আসছিল। তাই গত ১৫ বছরে আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার উন্নতি হওয়ায় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ১০ শতাংশ, যা এতদঞ্চলে দ্রুততম বলা চলে।

সীমান্তবর্তী আসাম উপত্যকা ছাড়া রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল পর্বতাকীর্ণ। সরমতী পর্বত সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ, উচ্চতা ৩হাজার ৮শো ৪০ মিটার এবং এই পর্বতমালা ন্যাগল্যান্ড ও বর্মার মধ্যে প্রাকৃতিক দেয়াল তৈরি করেছে। এটি ৯৮° ও ৯৬° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ বারাবর সমান্তরাল এবং ২৬.৬° ও ২৭.৩° উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। এটি বিপুল উদ্ভিদ ও প্রাণিবৈচিত্র্যের আবাসস্থল। একে বিশ্বের 'ঈগল রাজধানী' বলা হয়।

ইতিহাস

নাগাদের প্রাচীন ইতিহাস ধোঁয়াশাবৃত্ত। বিভিন্ন সময়ে উপজাতীয়রা বর্তমান ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে নিজ নিজ সার্বভৌম পার্বত্যভূমি ও গ্রাম-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা উত্তরাঞ্চলের মঙ্গোলীয় এলাকা কিংবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম চিন থেকে এসেছে কিনা জানা যায় না। তবে তাদের উৎস ও বসতি পূর্ব-ভারতে, এটুকু বলা যায়। একটি ঐতিহাসিক তথ্যে দেখা যাচ্ছে, বর্তমান নাগাদের আগমন ও বসতি স্থাপন ১২২৮ অব্দে অহোমদের আগমনের পূর্বেই হয়েছে।

নাগা শব্দের অর্থও সুস্পষ্ট নয়। সাধারণভাবে ধরা হয়, যদিও তা বিতর্কিত, নাগা শব্দটি এসেছে বার্মিজ শব্দ 'নাকা' বা 'নাগা' থেকে, যার অর্থ কানে দুল পরা মানুষ। আরেকটি অর্থ সুচলো নাক। নাকা বা নাগা বার্মিজ ভাষায় একইভাবে উচ্চারিত হয়। নাগাল্যান্ডের প্রাচীন নাম নাকাঞ্চি বা নাগাঞ্চি– নাগা ভাষা থেকে উদ্ভূত।

দক্ষিণ এশিয়ায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পত্তনের আগে ভারতের উত্তর-পূর্বে বসবাসকারী নাগা উপজাতি, মেইতেই জনগণ ও অন্যদের ওপর বর্মা থেকে অনেক অভিযান, যুদ্ধ, হত্যা, নির্যাতন চালানো হয়েছে। দখলবাজরা এখানে মাথা (মানুষের) শিকার, লুটপাট, অন্যান্য উপজাতি ও জাতিগত গোষ্ঠী থেকে বন্দী করে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য আসত। ব্রিটিশরা খোঁজখবর নিতে গেলে বার্মিজ গাইডরা উত্তর হিমালয়ে বসবাসকারী মানুষদের 'নাকা' বলে উল্লেখ করত। এভাবে নাগা কথাটি লিপিবদ্ধ হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ রাজ কায়েম হয় এবং নাগা পর্বতমালাসহ সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া তাদের করতলগত হয়। এ পার্বত্য অঞ্চলে ১৮৩২ সালে আগমনকারী ইউরোপীয় হলেন ক্যাপ্টেন জিঙ্কিনস্ ও ক্যাপ্টেন পেমবার্টন। নাগা উপজাতীয়দের সঙ্গে তাদের প্রথম সংযোগ ছিল সন্দেহ ও বিরোধপূর্ণ। নাগা উপজাতীয়দের সাহসিকতা এবং মাথা শিকার-এর অভ্যাস থাকায় আসামে ঔপনিবেশিক স্বার্থ, যেমন চা ও অন্যান্য ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব আক্রমণ বন্ধে ব্রিটিশ সৈন্যরা ১৮৩৯ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত এখানে রেকর্ডসংখ্যক ১০ বার সামরিক অভিযান পরিচালনা করে। ১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কিক্রুমার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ব্রিটিশ ও নাগা উপজাতীয়দের পক্ষে অনেক মানুষ হতাহত হয়। যুদ্ধের পরেও অন্তর্ঘাতমূলক যুদ্ধে বহু প্রাণহানি হয়। সেই যুদ্ধের পর ব্রিটিশরা নাগা উপজাতীয়দের সঙ্গে সম্মান বজায় রাখা ও হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করে। যদিও সে-নীতি ব্যর্থ হয়।

১৮৫১ থেকে '৬৫ সাল পর্যন্ত নাগা উপজাতীয়রা আসামে ব্রিটিশদের ওপর আক্রমণ অব্যাহত রাখে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের অভিঘাতে ব্রিটিশ সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলসহ গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় সরকার পরিচালন কাঠামোয় ব্যাপক রদবদল আনে। ১৮৬৬ সালে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রশাসন আন্তঃউপজাতীয় সংঘাত ও জানমালের ওপর উপজাতীয়দের আক্রমণ বন্ধের লক্ষ্যে আধুনিক নাগা ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রশাসন সামাগুটিংয়ে একটি প্রশাসকের পদ সৃষ্টি করে। ১৮৬৯ সালে ক্যাপ্টেন বাটলার এ পদে নিযুক্ত হন এবং নাগাল্যান্ড পর্বতমালায় ব্রিটিশ উপস্থিতি সুসংহত করেন। ১৮৭৮ সালে এ সদর দফতর কোহিমায় স্থানান্তরিত হয়। ক্রমে কোহিমা শহর গড়ে ওঠে এবং নাগাল্যান্ডের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক, ব্যবসায় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়।

১৮৭৯ সালের ৪ অক্টোবর জি এইচ ডামন্ট নামে একজন রাজনৈতিক এজেন্ট সসৈন্যে খোনোমায় যান এবং তার দলের ৩৫ জন সৈন্যসহ গুলিতে প্রাণ হারান। পরবর্তীকালে কোহিমা আক্রমণ ও লুটপাটের শিকার হয়। এই সহিংসতা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছয় যে, ব্রিটিশরাজ সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও জবাব দিতে বদ্ধপরিকর হয়। ফলশ্রুতিতে কোহোরার পতনের মধ্য দিয়ে নাগা পার্বত্য অঞ্চলে লাগাতার বৈরিতার অবসান ঘটে।

১৮৮০ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রশাসন নাগা পর্বতমালার একটি বড় অংশে তাদের শাসন সুসংহত করে এবং আসাম কর্মকাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করে। ব্রিটিশ প্রশাসন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য রূপির প্রবর্তন করে এবং এক বিশেষ ধরনের উপজাতীয় সরকার কাঠামো প্রবর্তন করে। এসব উন্নয়ন নাগা জনগণের মধ্যে সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করে।

এর পাশাপাশি উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ থেকে খ্রিস্টানরা ভারতে আসতে এবং নাগাল্যান্ড ও প্রতিবেশী রাজ্যসমূহে ধর্মপ্রচার করতে শুরু করে। ফলে নাগাল্যান্ডের নাগা উপজাতীয়রা খ্রিস্ট

কোহিমা শহরের ক্যাথলিক ক্যাথেড্রাল

কোহিমা যুদ্ধ কবরখানা

কোহিমা যুদ্ধ জাদুঘর

ধর্মে দীক্ষিত হয়।

বিংশ শতাব্দী

১৯৪৪ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে জাপানি সৈন্যদের সহায়তায় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বর্মার মধ্য দিয়ে কোহিমা আক্রমণ করে একে স্বাধীন করার উদ্যোগ নেয়। বেসামরিক লোকজনকে সরিয়ে নেওয়া হয়। ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যরা কোহিমা রক্ষা করতে সক্ষম হয়। ১৯৪৪ সালের জুন মাসের যুদ্ধে উভয় পক্ষে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। জাতীয় ন্যাশনাল আর্মির রসদ ফুরিয়ে যাওয়ায় অনেকে মৃত্যুবরণ করে, অনেকে বর্মার পথে পশ্চাদপসরণ করে।

জাতীয় জাগরণ, রাজ্যের মর্যাদালাভে কার্যকর পদক্ষেপ

১৯২৯ সালে নাগা ক্লাব (যা পরবর্তীকালে নাগা জাতীয় পরিষদ হিসেবে পরিগণিত হয়) নেতৃবৃন্দ সাইমন স্টেটুটরি কমিশনের কাছে এক স্মারক পেশ করে যেখানে নতুন করারোপ ও সংস্কার বন্ধ করে নাগাদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার তাদের ওপর ন্যস্ত করার দাবি জানানো হয়। এক স্মারকের ফলে ব্রিটিশ হাউজ অফ কমন্স নাগা পার্বত্য অঞ্চলকে নতুন সংবিধানের বহির্ভূত বলে ডিক্রি প্রদান করে। ১৯৩৫ সালের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টে নাগাল্যান্ডকে বহির্ভূত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পরে ১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল একে রানীর প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আনা হয়–আসাম প্রদেশের গভর্নর এর শাসক নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ সালের জুন মাসে নাগা ক্লাব ওখায় এক সম্মেলনের মাধ্যমে নাগা জাতীয় পরিষদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪৬ সালের জুন মাসে নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছে স্বাধীনতার দাবিতে ৪-দফা প্রস্তাব পেশ করে যেখানে নাগাদের জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, উপযুক্ত নিরাপত্তা ও স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার দাবি জানানো হয়।

১৯৪৬ সালের ১ আগস্ট কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নাগাদের ৪-দফা দাবির প্রেক্ষিতে তাদের ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দেয়ার আহ্বান জানান। ১৯৪৭-এ ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর নাগাল্যান্ড আসামের অংশ হিসেবে রয়ে যায়।

ডিমাপুর বিমান বন্দর

নাগাদের একটা অংশের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৫৫ সালে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনি মোতায়েন করা হয়। ১৯৫৭ সালে নাগা নেতৃবৃন্দ ও ভারত সরকারের মধ্যে চুক্তির ফলে নাগা পার্বত্য অঞ্চলে নাগা হিলস টুয়েনসাং এলাকা নামে একটি রাজনৈতিক এলাকার সৃষ্টি হয় এবং ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন নিয়ে এটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়। কিন্তু এতেও উপজাতীয়দের সন্তুষ্ট করা যায়নি। ১৯৬০ সালের জুলাইয়ে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু নাগা পিপলস কনভেনশন (এনপিসি)-এর সঙ্গে ১৬ দফা চুক্তিতে নাগাল্যান্ডকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা প্রদান করেন। ১৯৬৩ সালের ১ ডিসেম্বর কোহিমাকে রাজধানী করে আনুষ্ঠানিক নাগাল্যান্ড রাজ্যের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসের নির্বাচনের পর ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে নির্বাচিত নাগাল্যান্ড বিধানসভার যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু এত কিছুর পরেও বিদ্রোহ, ডাকাতি, আন্তঃউপজাতীয় কোন্দল, ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা একেবারে নির্মূল করা যায়নি। সহিংসতা বন্ধে ১৯৭৫ সালের মার্চে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নাগাল্যান্ডে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করেন। ২০১২ সালের রাজ্যের নেতৃবৃন্দ শান্তি পুনরুদ্ধারে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। ২০১৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি নাগাল্যান্ডে ৬০ আসন বিশিষ্ট বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নাগাল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট ৩৭টি আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে।

কোহিমার যুদ্ধ

১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে কোহিমার যুদ্ধে ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনি জাপানি সৈন্যদের হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়। ৪ এপ্রিল থেকে ২২ জুন পর্যন্ত যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের পর এখানে একটি যুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। কোহিমা ক্যাথেড্রালের নিকটবর্তী আরাডুরা পাহাড়ে অবস্থিত ৪হাজার ব্রিটিশ সৈন্য ও ৩হাজার জাপানি সৈন্যের স্মৃতি-বিজড়িত এ যুদ্ধ-জাদুঘরটি জাপানি সৈন্যদের পরিবার ও তাদের বন্ধুদের আর্থিক সহায়তায় নির্মিত হয়।

ঐতিহাসিক প্রথা

'মাথা শিকার' নাগা পুরুষদের শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন ও নারীর মন জয়ের উপায়। বিবাহের পূর্বশর্ত হিসেবে পুরুষদের অন্যান্য উপজাতি কিংবা প্রতিবেশী রাজ্য আক্রমণ করে যতটা সম্ভব মানুষ খুন করে তাদের মাথা কেটে আনতে হত। সকল মাথা-শিকারীকে অলংকার পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হত। উনবিংশ শতাব্দীতে এ প্রথা বাতিল করা হয়। এখন নাগাদের মধ্যে আর এ প্রথার চর্চা নেই।

মর্যাদাবৃদ্ধির ভোজ

নাগা সমাজে সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি লাভ করতে হলে নাগা পুরুষকে বীরত্বসূচক 'মাথা শিকার' করতে হত। এখন সে প্রথা বন্ধ হওয়ায় তার পরিবর্তে অনেকগুলো ভোজের আয়োজন করতে হয়। শুধুমাত্র বিবাহিত পুরুষেরাই এ ধরনের ভোজের আয়োজন করতে পারে। ভোজের দিন আয়োজকের স্ত্রীর বিরাট ভূমিকা থাকে। তাকে ঘরে তৈরি মদ দিয়ে

সশস্ত্র নাগা অঙ্গামি যোদ্ধা

নাগা যুবক

নাগাল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে জনৈক নাগা বৃদ্ধ

অতিথিদের আপ্যায়ন করতে হয়। উপজাতীয় গোষ্ঠীর সবাইকে এদিন ভোজের নিমন্ত্রণ করা হয়। জাঁকজমকপূর্ণ ভোজের পর আয়োজক দম্পতিকে গোষ্ঠীর তরফ থেকে সম্মানসূচক অলংকার পরিয়ে দেওয়া হয়।

ভূগোল

নাগাল্যান্ড ব্যাপক পর্বতবেষ্টিত রাজ্য। আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে উদ্ভূত হয়ে নাগা পর্বতমালা আরো দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রসারিত হয়েছে। উচ্চতা সূচনায় ২হাজার ফুট, ত্রমে ৬হাজার ফুট পর্যন্ত। রাজ্যের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সরমতী পর্বতের উচ্চতা ১২হাজার ৬শো ১ফুট। এখানে নাগা পর্বতমালা বর্মার পাতকাই পর্বতমালার সঙ্গে মিশে সীমানা তৈরি করেছে। উত্তরে ডোয়াং ও ডিফু এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে বরাক নদী গোটা রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করেছে। রাজ্যের ২০ শতাংশ জমি বনভূমি– উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের স্বর্গ। রাজ্যের কৌশলগত এলাকায় চিরহরিৎ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বন দেখা যায়।

জলবায়ু

উচ্চ আর্দ্রতার মাত্রা নিয়ে নাগাল্যান্ডের জলবায়ু প্রধানত মৌসুমি। বার্ষিক বৃষ্টিপাত গড়ে ৭০ থেকে ১০০ ইঞ্চি। প্রধানত মে থেকে সেপ্টেম্বর মাসে বৃষ্টি হয়। তাপমাত্রা ৭০° ফারেনহাইট (২১° সেলসিয়াস) থেকে ১০৪° ফারেনহাইট (৪০° সেলসিয়াস)। শীতকালে তাপমাত্রা সাধারনত ৩৯° ফারেনহাইট (৪° সেলসিয়াস)-এর নীচে নামে না, তবে উঁচু পাহাড়ে বরফ পড়েই। জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ। গ্রীষ্ম স্বল্পদৈর্ঘ্য ঋতু, মাত্র দু'এক মাস স্থায়ী হয়। গ্রীষ্মে তাপমাত্রা ১৬° সেলসিয়াস (৬১° ফারেনহাইট) থেকে ৩১° সেলসিয়াস (৭৫° ফারেনহাইট)। রাজ্যের কিছু এলাকায় শীত আগেভাগে আসে এবং তীব্র ঠাণ্ডা ও শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করে। শীতকালে গড় তাপমাত্রা ২৪° সেলসিয়াস (৭৫° ফারেনহাইট)। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে শক্তিশালী উত্তর-পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হয়।

উদ্ভিদ ও প্রাণিকূল

নাগাল্যান্ডের প্রায় এক ষষ্ঠাংশ ভূমি উষ্ণমণ্ডলীয় ও উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় চিরহরিৎ বৃক্ষশোভিত বনভূমিতে পাম, বাঁশ, বেত ও মেহগনিই প্রধান। জুম চাষের জন্য অনেক বনভূমি উজাড় করা হচ্ছে। বনাঞ্চলে কুকুর, বনরুই, সজারু, হাতি, চিতা, ভল্লুক, অনেক প্রজাতির বানর, সম্বর, হরিণ, ষাঁড় ও মোষ দাপিয়ে বেড়ায়। গ্রেট ইন্ডিয়ান হর্নবিল রাজ্যের অন্যতম পরিচিত পাখি। নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাখি হচ্ছে এক মূল্যবান প্রজাতির কবুতরসদৃশ পাখি, নাম– ব্লিথ'স ট্রাগোপান। জুনহেবোটো জেলার সাটোই পর্বতমালা, ফেক জেলার ফুটসেরো এবং কোহিমা জেলার জুকৌ উপত্যকা ও জাফু পাহাড়ে এদের দেখা যায়। মাত্র ২হাজার ৫০০ ট্রাগোপান বিশ্বে এখন দেখা যায়, তার মধ্যে হাজারখানেকের বেশি দেখা যায় জুকৌ উপত্যকায়। এটিই তাদের প্রাকৃতিক বাসস্থান। রডোডেনড্রন হচ্ছে রাজ্যফুল। একমাত্র উত্তর পূর্ব ভারতে দৃশ্যমান মিঠুন (আধা-গৃহপালিত গাউর) নাগাল্যান্ডের রাজ্যপশু, যা নাগাল্যান্ড সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক সিল। এটি প্রথাগতভাবে রাজ্যের সবচেয়ে মূল্যবান প্রজাতি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এই প্রজাতিকে রক্ষা করার জন্য জাতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ ১৯৮৮ সালে 'জাতীয় মিঠুন গবেষণা কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করে।

জনমিতি

নাগাল্যান্ডের জনসংখ্যা প্রায় ২০ লাখ। এর মধ্যে ১০ লাখ ৪০ হাজার পুরুষ। জেলাগুলির মধ্যে ডিমাপুরের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি (৩লাখ ৭৯হাজার ৭শো ৬৯জন)। তারপর কোহিমার অবস্থান (২লাখ ৭০হাজার ৬৩জন)। লংলেং জেলার জনসংখ্যা সবচেয়ে কম (৫০হাজার ৫শো ৯৩)। ৭৫ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। ২০১৩ সালের জনগণনা অনুযায়ী গ্রামের প্রায় ১০শতাংশ মানুষ এবং শহরের প্রায় ৪শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে।

ভাষা

নাগাল্যান্ডে প্রায় দুশোর মত ভাষা আছে। এর মধ্যে আও (১২.৯১%), কোনিয়াক (১২.৪৬%), লোঠা (৮.৪৪%), অঙ্গামি (৬.৫৮%), ফোম (৬.১৩%), সুমি (৬.৬৭%), ইমচুনগ্রে (৪.৬%), সাংটাম (৪.২২%), চাকরু (৪.১৭%), চাং (৩.১১%), জেলিয়াং (৩.০৬%), রেংমা (২.৯১%), কুকি (১%) ও অন্যান্য (২৩.৭৫%) উল্লেখযোগ্য।

পের গ্রিয়ারসনের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী নাগা ভাষাগুলিকে পশ্চিম, মধ্য ও পূর্বাঞ্চলীয় নাগা বিভাগে ভাগ করা হয়। পশ্চিম বিভাগে রয়েছে অঙ্গামি, চোকরি ও খেজা। মধ্যভাগে আছে আও, সুমি, লোঠা ও সাংটাম। পূর্ববিভাগে আছে কোনিয়াক ও চাং। এছাড়াও নাগা-বোড়ো ভাষা বিভাগে আছে মিকির ভাষা, কুকি বিভাগে আছে সোপভামা (মাও নাগাও বলা হয়) ও লুপ্পা ভাষা। এসব ভাষা প্রধানত চিনা-তিব্বতীয় ভাষা পরিবারের।

১৯৬৭ সালে নাগাল্যান্ড বিধানসভা ইংরেজিকে রাজ্যের সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। এটি নাগাল্যান্ডের শিক্ষার মাধ্যম। ইংরেজি ছাড়াও নাগামিজ (ইন্দো-আর্য-অসমীয় ভাষার সংমিশ্রণ) ব্যাপক প্রচলিত ভাষা।

হর্নবিল উৎসবের উদ্বোধন করছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি

ব্লিথ'স ট্রাগোপান

গ্রেট ইন্ডিয়ান হর্নবিল

আমুর ঈগল

ধর্ম

২০১১ সালের হিসেব অনুযায়ী নাগাল্যান্ডে খ্রিস্টান (৮৭.৯৩%), হিন্দু (৮.৭৫%), মুসলিম (২.৪৭%), বৌদ্ধ (০.৩৪%), জৈন (০.১৩%), শিখ (০.১%), নাগা লোকজ ধর্ম ও অন্যান্য (০.১৬%) এবং ধর্মহীন (০.১২%)। মেঘালয় ও মিজোরামের পর নাগাল্যান্ড হচ্ছে ভারতের তৃতীয় খ্রিস্টান-অধ্যুষিত রাজ্য। কোহিমা, ডিমাপুর, মোকোকচুংয়ে বড় বড় গির্জা আকাশ ছুঁয়েছে। নাগাল্যান্ড পৃথিবীর একমাত্র ব্যাপ্টিস্ট-অধ্যুষিত রাজ্য। ওখা ও কোহিমা জেলার কিয়দংশ এবং কোহিমা ও ডিমাপুরের শহর এলাকায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ক্যাথলিকের বাস।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নাগাল্যান্ডে খ্রিস্টধর্মের আগমন ঘটে। ১৮৩৬ সালে আসাম মিশনে আমেরিকার ব্যাপ্টিস্ট নাগা মিশনের জন্ম। মাইলস ব্রোনসন, নাটান ব্রাউন ও অন্যান্য খ্রিস্টান মিশনারিরা জয়পুরের বাইরে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য অংশে কাজ করতে গিয়ে দেখেন ভারতের উত্তর-পূর্বের সর্বপ্রাণবাদী ও লোকজ ধর্মের মানুষদের ধর্মান্তরিত করা সহজ। সেভাবেই নাগাল্যান্ডে খ্রিস্টধর্মের বাড়বাড়ন্ত। নাগাল্যান্ডে হিন্দু, মুসলমান ও জৈন ছাড়াও জেলিয়াংগোরং উপজাতির ৪হাজার ১শো ৬৮জন মানুষ 'হেরাকা' নামে পরিচিত এক প্রাচীন দেশীয় ধর্মে বিশ্বাসী।

সরকার

গভর্নর রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান, ভারতের রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছাড়াও তাঁকে অনেক আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিধানসভা রাজ্যের প্রকৃত নির্বাহী ও আইনসভা। আসনসংখ্যা ৬০। নির্বাচিত বিধায়করা একজন মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার গঠন করেন। নাগাল্যান্ডে ব্যাপক রাজ্য-স্বায়ত্তশাসন ছাড়াও নাগা উপজাতীয়দের নিজস্ব বিষয়াদি পরিচালনার জন্য বিশেষ ক্ষমতা ও স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন

ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স অফ নাগাল্যান্ড ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ও জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর সঙ্গে সরকার পরিচালনা করছে। ২০০৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর নাগা পিপলস ফ্রন্ট ও বিজেপির সঙ্গে জোট হয়।

হর্নবিল উৎসবের একটি দৃশ্য

নাগরিক কেন্দ্রসমূহ

নাগাল্যান্ডের প্রধান নাগরিক কেন্দ্রগুলো হচ্ছে– ডিমাপুর, কোহিমা, মোকোকচুং, ওখা, জুনহেবোটো, টুয়েনসাং, মোন, লংলেই ও কিফাইর। জেলা সদর দফতর নয় এমন প্রধান শহরের মধ্যে আছে টুলি, ম্যাংকোলেম্বা, নাগানিমোরা, চাংটোঙ্গিয়া, টিজিট, সেমিনয়ু, ভাণ্ডারি, অখুলুটো, ফুটসেরো, অঘুনাটো, অবোই, টোবু প্রভৃতি।

অর্থনীতি

২০১১-১২ অর্থবছরে নাগাল্যান্ডের গড় দেশজ উৎপাদন (জিএসডিপি) প্রায় ১২হাজার ৬৫কোটি রুপি (১শো ৮০কোটি ডলার)। নাগাল্যান্ডের জিএসডিপি প্রবৃদ্ধি এক দশক ধরে বছরে প্রায় ৯.৯%। ফলে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণেরও বেশি।

নাগাল্যান্ডে সাক্ষরতার হার উচ্চ– ৮০.১%। রাজ্যে অধিকাংশ লোক ইংরেজিতে কথা বলে, এটি রাজ্যের সরকারি ভাষা। রাজ্যে কারিগরি ও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার প্রভূত সুযোগ রয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও কৃষি ও বনবিদ্যা গড় দেশজ উৎপাদনে বিরাট ভূমিকা রাখে। নাগাল্যান্ড কয়লা, চুনাপাথর, লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, ক্রোমিয়াম ও মার্বেলের মত খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। রাজ্যে ১০০কোটি টন চুনাপাথরের আহরণযোগ্য মজুদ রয়েছে। আছে মার্বেল ও চারুকলার উপযোগী পাথর।

রাজ্যের প্রায় ৬৮% মানুষ গ্রামীণ চাষাবাদের ওপর নির্ভরশীল। প্রধান ফসলগুলি হচ্ছে ধান, গম, ভূট্টা, ডাল। আখ ও আলুর মত নগদ অর্থকরী শস্যও কিছু কিছু এলাকায় জন্মে। পার্বত্য অঞ্চলে আবাদী শস্য যেমন– কফি, এলাচ, চা কিছু পরিমাণে জন্মে, তবে এর সম্ভাবনা উজ্জ্বল। অধিকাংশ লোক ধান চাষ করে, কারণ এটা মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য। ফসলী জমির প্রায় ৮০ শতাংশে ধান চাষ করা হয়। তেলবীজ নাগাল্যান্ডের আরেকটি অর্থকরী ফসল। বর্তমানে জুম ও আবাদী চাষের অনুপাত ৪ ঃ ৩। তবে জুম চাষকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। জমির গাছগাছালি কেটে পোড়ানোর ফলে জমির ক্ষতি হয়, পরিবেশ দূষিত হয়। রাজ্যে পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদিত হয় না, ফলে ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে খাদ্য শস্য কিনতে হয়।

বনও আয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বয়ন, কারুকাজ ও মৃৎশিল্প রাজস্ব আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। অধুনা পর্যটন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা এবং বেসরকারি কোম্পানিগুলি নাগাল্যান্ডের পর্যটন শিল্প প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।

রাজ্যে ৮৭.৯৮ এমইউ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। চাহিদা আছে ২৪২.৮৮ এমইউ-এর। জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও নাগাল্যান্ডকে বিদ্যুৎ কিনতে হয়।

নাগাল্যান্ডের বিরল অর্কিড– কোপৌ ফুল

নাগাল্যান্ডের নকশাকাটা ঐতিহ্যবাহী শাল

প্রায় ২০ বছরের ব্যবধানে নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী টি আর জেলিয়াং ২০১৪ সালের জুলাইয়ে ওখা জেলার চাংপাং ও সোরি এলাকায় তেল অনুসন্ধান কাজের উদ্বোধন করেছেন।

পর্যটন

উত্তর-পূর্ব ভারতে অনবদ্য ও কৌশলগত অবস্থানের কারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য পর্যটন খাত অতি সম্ভাবনাময়। হর্নবিল উৎসব আয়োজনে রাজ্য অত্যন্ত সফল। এ উৎসবে আসতে দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক আকর্ষণ বোধ করেন। নাগাল্যান্ডে পর্যটনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে এর সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, এর ইতিহাস ও বন্যপ্রাণি। অতীতের সন্ত্রাস ও সহিংসতা পিছনে ফেলে রাজ্যের পর্যটন অবকাঠামো দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে।

উৎসব

নাগাল্যান্ড ভারতের উৎসবভূমি হিসেবে পরিচিত। এখানকার জনগণ ও উপজাতীয়দের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বেশভূষা সারা বছরজুড়ে উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে খ্রিস্টীয় উৎসব। ঐতিহ্যবাহী-উপজাতিবিষয়ক উৎসব কৃষিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, যেহেতু নাগাল্যান্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকটি উপজাতির আলাদা আলাদা উৎসব রয়েছে। এখানে তার কয়েকটির উল্লেখ করা হল: অঙ্গামিদের সেক্রেনেই উৎসব হয় ফেব্রুয়ারি মাসে; আওদের মোয়াৎসু ও সুংগ্রেমং হয় মে ও আগস্ট মাসে; চাকেসাংদের সুখেনি ও সেক্রেনেই হয় এপ্রিল-মে ও জানুয়ারি মাসে; চাংদের খুনডাংলেম, নুকনিউ লেম হয় এপ্রিল ও জুলাই মাসে; ডিমাসা কাচারিদের বুশু, জিবা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় জানুয়ারি ও এপ্রিল মাসে; খিয়ামনিউঙ্গমদের মিউ ও সোকুম হয় মে ও অক্টোবর মাসে; কোনিয়াকদের আওলিয়াং মোনিউ, লাও-অং মো অনুষ্ঠিত হয় এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর মাসে।

নাগাল্যান্ডের হর্নবিল উৎসব

আন্তঃউপজাতীয় যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রসারে নাগাল্যান্ড সরকার ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে হর্নবিল উৎসবের আয়োজন করে। রাজ্য পর্যটন বিভাগ এবং শিল্প ও সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজিত হর্নবিল উৎসব একই ছাদের নিচে সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর সম্মিলন। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কোহিমা থেকে ১২ কিমি দূরে কিসামায় নাগা ঐতিহ্য গ্রামে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উৎসবে নাগাল্যান্ডের সকল উপজাতি অংশগ্রহণ করে। নাগাল্যান্ডের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি রক্ষা এবং এর ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করাই এ উৎসবের লক্ষ্য।

উৎসবের নামকরণ করা হয়েছে হর্নবিল পাখির নামে। উৎসবে নাগাল্যান্ডের নিজস্ব শিল্প, হস্তশিল্প, খাবারের দোকান, হার্বাল ওষুধ বিক্রিসহ নাচ-গান, ফ্যাশন শো, সুন্দরী প্রতিযোগিতা, ঐতিহ্যবাহী তীরন্দাজী, নাগা কুস্তি, দেশীয় খেলাধূলা ও গানের জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের বাড়তি আকর্ষণের মধ্যে কনিয়াক ফায়ার ইটিং, শুয়োরের চর্বি খাওয়ার প্রতিযোগিতা, হর্নবিল সাহিত্য উৎসব, হর্নবিল বল, কোরাল প্যানোরামা, উত্তর-পূর্ব ভারতীয় ঢাক তৈরি, নাগা কিং মরিচ খাওয়ার প্রতিযোগিতা, হর্নবিল ন্যাশনাল রক প্রতিযোগিতা, হর্নবিল আন্তর্জাতিক মোটর র‍্যালি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুরনো গাড়ির র‍্যালি উল্লেখযোগ্য।

যাতায়াত/পরিবহন

নাগাল্যান্ড ব্রডগেজ ট্রেন লাইন মাত্র ১২.৮৪ কিমি। জাতীয় মহাসড়ক ও রাজ্য সড়কের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৩৬৫ কিমি ও ১ হাজার ৯৫ কিমি। নাগাল্যান্ডের পরিবহন নেটওয়ার্কের মেরুদণ্ড হচ্ছে সড়ক। এছাড়া আছে ১৫ হাজার কিমি স্থলপথ, তবে প্রতিকূল আবহাওয়ায় এসবের রক্ষণাবেক্ষণ সন্তোষজনক নয়। জনসংখ্যার সাপেক্ষে স্থলপথের প্রতি কিলোমিটার ব্যবহারে নাগাল্যান্ডের অবস্থান এতদঞ্চলে অরুণাচল প্রদেশের পরেই।

বিমানপথ

ডিমাপুর বিমানবন্দরের দূরত্ব ডিমাপুর থেকে ৭ কিমি, কোহিমা থেকে ৭০ কিমি। নাগাল্যান্ডের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা ও আসামের ডিব্রুগড়ের নির্ধারিত বাণিজ্যিক বিমান সার্ভিস রয়েছে।

শিক্ষা

রাজ্য, কেন্দ্রীয় ও বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনার জন্য নাগাল্যান্ডে নানা বিদ্যালয়ের পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষার জন্য নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় (কেন্দ্রীয়), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি নাগাল্যান্ড এবং ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড ফিনানসিয়াল এনালিস্টস অফ ইন্ডিয়া (বেসরকারি) রয়েছে।

সংস্কৃতি

নাগাল্যন্ডের ১৬টি প্রধান উপজাতির প্রত্যেকেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, বেশভূষা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। প্রত্যেকটি উপজাতি অনন্য নকশা ও রঙের শাল, ঝোলা ব্যাগ, সুসজ্জিত বল্লম, টেবিল ম্যাট, কাঠ খোদাই ও বাঁশের জিনিসপত্র তৈরি করে। অনেক উপজাতির মধ্যে নকশাদার শাল পরা আভিজাত্যের প্রতীক। আও উপজাতির শালের নাম সুঙ্কোটেপসু ও রোঙসু, লোঠাদের শালের নাম সুটাম, এঠাসু, লংপেনসু; সাংটামদের শালের নাম সুপং; ইমচুনাগারদের শালের নাম রংখিম ও সুনগ্রেম খিম। অঙ্গামিদের লোহে শালে সুতোর নকশায় জীবজন্তুর মোটিফ থাকে। ঐতিহ্যবাহী নাগা সংস্কৃতিতে লোকগীতি ও নাচ অপরিহার্য উপাদান। রূপকথা ও গানের মধ্য দিয়ে নাগা সংস্কৃতি জীবন্ত হয়ে ওঠে।

সংবাদপত্র

নাগাল্যান্ডের সংবাদপত্রের মধ্যে ইস্টার্ন মিরর, নাগাল্যান্ড পেজ, নাগাল্যান্ড পোস্ট, দি মোরাং এক্সপ্রেস উল্লেখযোগ্য।

সূত্র উইকিপিডিয়া
অনুবাদ মানসী চ্যেধুরী

নিবন্ধ

গৌড়ীয় নৃত্য

বাংলার ধ্রুপদী নৃত্য

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

গৌড়ীয় নৃত্য নামটা অর্বাচীন শোনালেও, মোটেও সে নবীন নয়। খ্রিস্টপূর্ব সময় থেকেই এর অস্তিত্ব জানা যায় শাস্ত্রে, ভাস্কর্যে। বাঙালি জাতি নৃত্য-গীত-বাদ্যপ্রিয় জাতি। বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রচলিত জনপ্রিয় শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কিছু আগে বা কিছু পরে একে একে আত্মপ্রকাশ করে বিংশ শতাব্দীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলার ক্ষেত্রেও একইভাবে বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্য– গৌড়ীয় নৃত্য আত্মপ্রকাশ করেছে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তার বিগত দিনের বহু ঐশ্বর্যসম্ভারে পুনর্গঠিতরূপে। শাশ্বত তার এই হাজার হাজার বছরের পথ পরিক্রমা।

গৌড়ীয় নৃত্যকে বিস্তর বাধা-বিঘ্ন ভোগ করতে হয়েছে। ইতিহাসের দিকে তাকালে বোঝা যাবে বৈদেশিক শাসনের ফলে বাংলার মন্দিরকেন্দ্রিক প্রাচীন ঐতিহ্যশালী গৌড়ীয় নৃত্য কালের কবলে ধুলোর আস্তরণে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। তার ফলে আমরা একটা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়েছিলাম যে বাংলার শাস্ত্রীয় বা ধ্রুপদী নৃত্য বলে কিছু নেই, হতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ-উদয়শঙ্কর অন্য জায়গার নাচ ধার করে বাংলার নৃত্য তৈরি করেছেন। কিন্তু একবারও ভেবে দেখিনি যে বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলির পিছনে তিনজন বাঙালির বিরাট অবদান আছে। একজন হলেন কবি জয়দেব (দ্বাদশ শতক), দ্বিতীয়জন চৈতন্যদেব এবং তৃতীয়জন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁদের ভিতর রবীন্দ্রনাথ অনন্য, কারণ তিনি ভারতবর্ষে তথা বিশ্বে প্রথম নৃত্য-গীত অনুশীলন ও অধ্যয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যগুলিকে পথ দেখিয়েছিলেন।

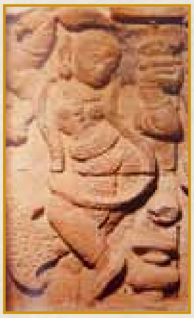

গৌড়ীয় নৃত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার গল্পটি বেশ চমকপ্রদ। ১৯৭০ সালে একটি পোড়ামাটির মন্দির অলঙ্করণ দেখেছিলাম। হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার প্রসিদ্ধ হংসেশ্বরী মন্দিরের পাশে তুলনামূলকভাবে অখ্যাত অনন্ত বাসুদেব টেরাকোটা মন্দিরে পোড়ামাটির নৃত্যভাস্কর্যগুলিই আমার মনে কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। মনে প্রশ্ন জেগেছিল এত সুন্দর নৃত্যভাস্কর্য বাংলায় কে করে গেল, কিভাবে করে গেল?

এমতাবস্থায় বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্য নেই, এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। জয়দেবের নিজেরই নৃত্য-গীতের দল ছিল। তাঁর রচিত গীতগোবিন্দ সারা ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলির আকর সাহিত্যগ্রন্থস্বরূপ। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং নৃত্য নাট্যাভিনয়ে পটু ছিলেন। গীতগোবিন্দের সারা ভারতে জনপ্রিয়তা লাভের পিছনে শ্রীচৈতন্যের যথেষ্ট ভূমিকা আছে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের আগে ও পরে যখন অন্য রাজ্যগুলি তাদের শাস্ত্রীয় নৃত্য তথা ভরত নাট্যশাস্ত্রের উত্তরাধিকারী বলে নিজেদের স্বীকৃত করে ফেলল, সেই সময়ে বাংলা তার বিভিন্ন সমস্যা, বিশেষত স্বাধীনতার আগে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, কলকাতা নগরীর পত্তন ও রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ এবং কলকাতামুখীন সর্বভারতীয় নাগরিক সংস্কৃতির ঢেউ, স্বাধীনতার পর দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, টিকে থাকার সংগ্রাম প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্ত থাকল, ফলে নিজের দেশজ হাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যময়ী নৃত্য-গীত-বাদ্য-নাট্য ও অন্যান্য সংস্কৃতির অনেকটাই অবহেলিত হল। ফলত বিশ্ববাসী তথা বাঙালিরও বদ্ধমূল ধারণা জন্মাল যে বাংলার কোন শাস্ত্রীয় নৃত্য নেই– কোনওকালেই ছিল না। কিন্তু অবিভক্ত বা বিভক্ত ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক মানচিত্রের দিকে তাকালেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। দক্ষিণভারত থেকে পূর্ব উপকূলের দিকে পরপর কেরালা-তামিলনাড়ু-অন্ধ্র প্রদেশ-ওড়িশা, তারপর মাঝে বৃহত্বঙ্গ একেবারে বাদ দিয়ে সুদূর মণিপুর রাজ্যে শাস্ত্রীয় নৃত্য। আবার এই শাস্ত্রীয় মণিপুরী নৃত্যের অন্তর্নিহিত বীজটি লুকিয়ে আছে গৌড় বাংলারই জঠরে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য-সংগীত-দর্শন এবং শাস্ত্রগ্রন্থের ওপর ভিত্তি করেই মণিপুরী লোকায়ত আঙ্গিকের পথ বেয়ে তৈরি হয়েছে মণিপুরী শাস্ত্রীয় নৃত্যের ইমারত। অর্থাৎ শাস্ত্রীয় মণিপুরী নৃত্য বহুলাংশে গৌড়ীর বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, শাস্ত্র ও সংগীতের কাছে ঋণী।

গৌড়ীয় নৃত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার গল্পটি বেশ চমকপ্রদ। ১৯৭০ সালে একটি পোড়ামাটির মন্দির অলঙ্করণ দেখেছিলাম। হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার প্রসিদ্ধ হংসেশ্বরী মন্দিরের পাশে তুলনামূলকভাবে অখ্যাত অনন্ত বাসুদেব টেরাকোটা মন্দিরে পোড়ামাটির নৃত্যভাস্কর্যগুলিই আমার মনে কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। মনে প্রশ্ন জেগেছিল এত সুন্দর নৃত্যভাস্কর্য বাংলায় কে করে গেল, কিভাবে করে গেল? সে সময় পশ্চিমবঙ্গে তথা কলকাতায় সেইভাবে খুব একটা শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রচলন ছিল না। খুব কমসংখ্যক ছেলেমেয়ে নাচ-গান শিখত। তখন পাড়ায় পাড়ায় রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গানের সঙ্গে নাচের প্রচলন ছিল আর ছিল কিছু পরিমাণে চটুলভাবে প্রদর্শিত কথক নৃত্যের; উচ্চাঙ্গ কথক বা ভরতনাট্যমের সেভাবে প্রচলন ছিল না। সে সময় নাচের কোনও তত্ত্বীয় বই সেভাবে সহজলভ্য ছিল না। নাচ যে একটা পড়বার জিনিস সে বোধই লোকের ছিল না। নাচ পরিগণিত হত বিনোদনের প্রকরণ রূপেই। সপ্তদশ শতাব্দীর অনন্ত বাসুদেব মন্দিরটি মানুষের মনে একটা আলোড়ন তুলল। অন্তর থেকেই তাগিদ অনুভব করলাম যে, বাংলা সাহিত্য পড়তে হবে, সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ পড়তে হবে, ভাস্কর্য-চিত্রকলা-লেখমালা সম্বন্ধে জানতে হবে, গ্রামীণ গুরুপরম্পরা নৃত্যধারা সম্বন্ধে জানতে হবে। ভেতরের প্রেরণা থেকে ১৯৭০ সালেই মনে হয়েছিল যে, এ সম্বন্ধে খোঁজখবর করতে হবে। পরবর্তীকালে ১৯৯০ সালের পর থেকে যখন অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্যের বই প্রকাশিত ও সহজলভ্য হল, জানতে পারলাম– অন্য শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলিও ঠিক একইভাবেই কাজ করেছে। নিচে গৌড়ীয় নৃত্যের ধারাবাহিকতা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল–

সাহিত্য ও ইতিহাস

চর্যাপদ ও নাথ সাহিত্যে তৎকালীন বাঙালির নাট্যাভিনয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বজ্রাচার্য ও দেবী দু'জনে মিলিত হয়ে বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনি নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে অভিনয় করেছেন–

'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই।' চর্যাপদ সং ॥১৭॥

নাথগীতিকায় দেখা যায় গোরক্ষনাথ তাঁর গুরু মীননাথকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন–

'নাচন্তি যে গোর্খনাথ মাদলে করি ভর
মাটিতে না লাগে পদ আলগ উপর।'

পাল-সেন রাজাদের আমলে (খ্রিস্টীয় ৮ম–১২শ দশক) সংস্কৃত সাহিত্যে জোয়ার বয়ে যায়। দেবদাসীদের কথা জানা যায় বিশেষভাবে। দেবদাসীরা বহু নামে অভিহিত হতেন– জনপদকল্যাণী, দেববারবণিতা, দেবাসিনী, দেয়াসিনী, নটী, বাররামা, সেবাদাসী, রুদ্রগণিকা ইত্যাদি। পালযুগে সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত*কাব্যে নৃত্যগীতের বর্ণনা পাওয়া যায়। যাঁরা 'নট' বৃত্তি করতেন, সমাজে তাঁদের সম্মানীয় আসন ছিল। উদাহরণস্বরূপ গঙ্গো নট, জয় নট প্রমুখের নামোল্লেখ করা যায়। প্রসিদ্ধ সেন রাজা লক্ষ্মণ সেনের দরবারে পাঁচজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন– জয়দেব, গোবর্ধন আচার্য, শরণ, ধোয়ী ও উমাপতি ধর। গোবর্ধন আচার্যের আর্যাসপ্তশতী, ধোয়ীর পবনদূত, জয়দেবের গীতগোবিন্দ নৃত্যগীতের আকর সাহিত্যগ্রন্থ। গীতগোবিন্দ তো সারা ভারতের নৃত্যকলা-চিত্রকলা সবকিছুকেই সমৃদ্ধ করেছে।

সেনযুগের পর খ্রিস্টীয় ১২০০ অব্দ শেষ হতে না হতেই বাংলায় তুর্কি আক্রমণের ঝড় বয়ে যায়। মোটামুটিভাবে ১২০০–১৩৫০ এই দেড়শ বছর বাংলার কোনও সাংস্কৃতিক নিদর্শন বা সামাজিক চিত্র পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁরা যেখান থেকেই আসুন না কেন, কালক্রমে সম্পূর্ণভাবে বাঙালি হয়ে পড়লেন। বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্য ভাগবত* থেকে জানা যায়, সে-যুগে রাত জেগে লোকে মনসার পাঁচালী দেখত, কৃষ্ণলীলা খুবই জনপ্রিয় ছিল। এগুলির প্রধান রূপ ছিল গীত ও পাঁচালী। পাঁচালী ছিল এক ধরনের গান– মৃদঙ্গ, মন্দিরা, চামর হাতে নৃত্যসহযোগে পরিবেশিত হত। মূল গায়েন গাইত এবং নাচত, অন্যরা দোহার হিসেবে তার সহযোগী হত। উত্তর-প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণলীলা অভিনীত হত– তাকে বলা হত নাট্যগীত বা নাটগীত। অভিজাত সমাজে নাটগীত ও অনভিজাত সমাজে লোকনাট্য প্রচলিত ছিল।

নৃত্যগীত ও প্রাঞ্জল বর্ণনায় সমৃদ্ধ বাংলার আরেকটি শাখা মঙ্গলকাব্য। বহু ধরনের মঙ্গলকাব্য আছে– মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, সারদামঙ্গল ইত্যাদি। সবগুলি মঙ্গলকাব্যই নৃত্যগীতের বর্ণনায় সমুজ্জ্বল। মনসামঙ্গল কাব্যের একটি ছোট উদাহরণ দেওয়া যাক, যেখানে নৃত্যগীত বাদ্যযন্ত্র সাজসজ্জা, বাদকবৃন্দের তথ্য আছে–

'সেই সজ্জ দিয়া বেউলা করিলেন সাজ।
বিশ্বাবসু চিত্রসেন দুই বাইন রাজ ॥
তাল টংকারিয়া কৈল মৃদঙ্গে আঘাত।
ধ্যান ভাঙ্গি ফিরিয়া বসিলা ভোলানাথ ॥
আলাপেয়ে পঞ্চমেতে বসন্তবাহার।
তার শেষে নৃত্য করে তালে করি ভর ॥'

নৃত্যগীত এদেশে সাধনার বিষয়বস্তু ছিল। নৃত্যকালীন তালভঙ্গ সে যুগে সমাজের কাছে একটি দণ্ডনীয় অপরাধ বলে পরিগণিত হত। যার প্রতিফলন ঘটেছে বাংলা সাহিত্যে, চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে স্বর্গনর্তকী রত্নমালার তালভঙ্গের কাহিনি পাওয়া যায় এবং উভয় ক্ষেত্রেই অভিশপ্ত হওয়ার বর্ণনা আছে–

'তালভঙ্গ হইল রামা লাজে হেটমুখী।
যতেক দেবতা সভে হইলা বিমুখী ॥
তালভঙ্গ দেখি তারে বলেন ভবানী।
যৌবন গরবে নাচ হয়ে অভিমানী ॥
সুধর্ম সভায় নাচ হয়ে খলমতি।
মানব হইয়া ঝাট চল বসুমতী ॥'

মধ্যযুগে গৌড়ীয় নৃত্যের বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী-নৃত্যগুরু ও নৃত্যনাট্যের প্রেরণাদাতা শ্রীচৈতন্যদেব। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাঁর আবির্ভাবের ফলে সংগীত (গীত-বাদ্য-নৃত্য) ও নাট্যজগতে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তার ফলে চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্য-শাস্ত্র-টেরাকোটা মন্দির সমস্ত সংগীতের তথ্যে সমৃদ্ধ। শ্রীচৈতন্যদেব সংকীর্তনে নাচতেন। তাঁর নাচের প্রকার ছিল দু'রকম– উচ্চণ্ড অর্থাৎ তাণ্ডব এবং মধুর অর্থাৎ লাস্য। তিনি করতেন 'নৃত্যসংকীর্তন' । তিনি *রুক্মিণীহরণ* নামে একটি নাট্যে রুক্মিণীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রাচীন থেকে মধ্য তথা আধুনিক যুগ পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের ধারাবাহিকতার সুনির্দিষ্ট তথ্য-নিদর্শন পাওয়া যায়, যা প্রচলিত বেশির ভাগ শাস্ত্রীয় নৃত্যের ক্ষেত্রে বিরল।

সংগীতশাস্ত্র তথা নৃত্যশাস্ত্র

প্রত্যেক শাস্ত্রীয় নৃত্যের শাস্ত্রগ্রন্থ থাকা আবশ্যক। কারণ একটি নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় নৃত্য তার শাস্ত্রগ্রন্থ অনুসারে নির্মিত হয়। যেমন, ভরতনাট্যম অনুসরণ করে নন্দীকেশ্বর রচনা করেন *অভিনয় দর্পণ*। কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার হল, নন্দীকেশ্বর কোথায় জন্মেছিলেন কেউ জানে না, তামিলনাড়ুতে নাও জন্মে থাকতে পারেন। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, শাস্ত্রীয় নৃত্য কথক-এর কোন শাস্ত্রগ্রন্থই নেই। এ জায়গায় দাঁড়িয়ে গর্বের সঙ্গে বলা যায় গৌড়ীয় নৃত্যের শাস্ত্রগ্রন্থ এই বাংলার পণ্ডিতেরাই লিখে গেছেন। সাহিত্যের পাশাপাশি গৌড়ীয় নৃত্যের শক্তিশালী ভিত্তি হল তার শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহ।

ভারতবর্ষের শাস্ত্রীয় নৃত্যের সবচেয়ে প্রাচীনতম গ্রন্থ হল ভরতমুনি রচিত *নাট্যশাস্ত্র*। এই নাট্যশাস্ত্রের চতুর্দশ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের বিষয়। গৌড়ীয় নৃত্যের মূল শাস্ত্রগ্রন্থ *সংগীত দামোদর*। আর হস্তমুদ্রার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাসহ গ্রন্থটির নাম *শ্রীহস্তমুক্তাবলী*। দুটি গ্রন্থই পণ্ডিত শুভঙ্করের (আনুমানিক ত্রয়োদশ-পঞ্চদশ শতক) লেখা এবং তিনি উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা ছিলেন। এছাড়াও আরও অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ রয়েছে।

ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও লেখমালা

ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও লেখমালার সঙ্গে সংগীতের বিশেষত নৃত্যের যোগ সুনিবিড়। প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প ও লেখমালায় বাংলার নৃত্যের বিবরণ, ভঙ্গিমা, বাদ্যযন্ত্র, বেশভূষা ইত্যাদি জ্ঞাতব্য তথ্য সম্পর্কে জানা যায়। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে চন্দ্রকেতুগড়, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নৃত্যভাস্কর্য পাওয়া যায়। এদেশে নানা প্রকার বস্তু দিয়ে ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে– মৃৎভাস্কর্য বা টেরাকোটা, ধাতব, কাষ্ঠ বা দারু, প্রস্তর, সোলা, হাতির দাঁত, বাঁশ। ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিত পর্যটকদের বিবরণ এবং প্রাচীন শিলালিপি বা তাম্রশাসনগুলি আলোচনা করলে কোন সন্দেহ থাকে না যে, প্রাচীন বাংলায় তুর্কি আক্রমণের আগে পর্যন্ত বিচিত্র কারুকার্য-খচিত বহু হর্ম্য ও দ্বাদশ ভৌম অর্থাৎ বারোতলা (উত্তরবঙ্গে) মন্দির ছিল। সবই ধ্বংস হয়েছে বৈদেশিক আক্রমণ ও জলবায়ু-আবহাওয়ার কারণে। তারপরেও প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য-ভাস্কর্য-চিত্রকলার নিদর্শন যা আছে, তা নৃত্য গবেষণার জন্য অপ্রতুল নয়। বাংলাদেশের পাহাড়পুর-মহাস্থানগড়-ময়নামতী, পশ্চিমবঙ্গের জগজীবনপুর-বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে এবং বিভিন্ন জাদুঘর যেমন– বেহালা স্টেট মিউজিয়াম, ঢাকা জাতীয় জাদুঘর, পাহাড়পুর জাদুঘর ইত্যাদিতে এখনও প্রচুর নিদর্শন দেখা যায়। রাজা নয়পাল দেবের সময় মূর্তিশিবের বাণগড় প্রশস্তি বা লেখমালা থেকে জানতে পারি শ্বেতশুভ্র মন্দিরে দশম শতাব্দীতে সহস্র দেবদাসীদের কথা। বিজয়সেনের দেওপাড়া বা দেবপাড়া প্রশস্তি বা লেখমালা থেকে চামরধারিণী একশ' দেবদাসীদের কথা জানা যায়। বাংলা সূক্ষ্ম চিত্রকলা বা মিনিয়েচার পেইন্টিংয়ের সূতিকাগার। ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সূক্ষ্ম চিত্রকলা পালযুগের 'অষ্টসহস্র প্রজ্ঞাপারমিতা'। এরপর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে সূক্ষ্ম চিত্রকলা ছড়িয়ে পড়ে। সরসীকুমার সরস্বতীর 'পালযুগের চিত্রকলা' গ্রন্থে নৃত্যরত বহু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। চৈতন্যপরবর্তী যুগে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তীযুগে বহু নৃত্যভঙ্গিমাযুক্ত চিত্রকলা পাওয়া যায়, যার অনেকগুলিই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। এছাড়াও আছে নানা নাট্য বিবরিত পটচিত্র এবং পাটাচিত্র। গৌড়ীয় নৃত্যের পথ-পরিক্রমায় এগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

গ্রামীণ গুরুমুখী লোকায়ত নৃত্যধারা

গৌড়ীয় নৃত্যের উৎসস্বরূপ সজীব লোকালয় নৃত্যধারাগুলি– কীর্তন নৃত্য, নাচনী, পুরুলিয়া ছৌ ইত্যাদি, যেগুলি প্রাচীনকাল থেকে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শাস্ত্রীয় উপাদান বহন করে চলেছে।

সংস্কৃতি জগতে সকলেই জানেন যে সমস্ত শিল্পই পরিমার্জনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে লোকশিল্প থেকে ধ্রুপদী শিল্পে উন্নীত হয়েছে। বাঙলাও তার ব্যতিক্রম নয়। অন্য দু'একটি শাস্ত্রীয় নৃত্যের উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। যেমন ভরতনাট্যমের উৎস হিসেবে মূল চারটি নৃত্যধারা– ১. সাদির বা দাসীঅট্টম, ২. কুরুভাঞ্জি, ৩. গ্রামীণ কুচিপুড়ী, ৪. ভাগবতমেলা নাটক।

ভরতনাট্যমের এগুলি হল মুখ্য উপাদান। এছাড়াও আছে বহু গৌণ উপাদান– চিন্নমেলম, ভোগমেলম, হরিকথা, তেরুকুথু ইত্যাদি। কথাকলির বিবর্তনের মুখ্য উপাদান– অষ্টপদী আট্টম (জয়দেবের গীতগোবিন্দ), কৃষ্ণনাট্যম, রামনাট্যম। শেষপর্যায়ে রামনাট্যম থেকে কথাকলি। এছাড়া গৌণ উপাদান– কলারিপাইয়ট্টু, কংসনাটকম, মিনাক্ষীনাটকম ইত্যাদি।

এইরকম বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত সবক'টি শাস্ত্রীয় বা ধ্রুপদী নৃত্যই লোকনৃত্যকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গৌড়ীয় নৃত্যের মুখ্য উপাদান আগেই আলোচিত হয়েছে, এরই পাশাপাশি গৌণ উপাদানও আছে, যেমন– যুদ্ধনৃত্য-রায়বেঁশে, গাজন, ধামাইল, কুশান ইত্যাদি।

বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় নৃত্যের মার্গ বা repertoire– বন্দনা, মঙ্গলাচরণ, আলাপচারী (বিশুদ্ধ তালপ্রধান নৃত্য), মহাজনপদনৃত্য, লীলাকীর্তন, পালানৃত্য ও দশানৃত্য। আবহসংগীতের গানের ভাষা– বাংলা, প্রাচীন বাংলা, সংস্কৃত, ব্রজবুলি, চর্যাপদের ভাষার গান ইত্যাদি। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় মৃদঙ্গ বা শ্রীখোল, পাখোয়াজ, ধামসা বা দুন্দুভি, ঢাক ইত্যাদি তালবাদ্য। তারযন্ত্র– সেতার, সরোদ, বেহালা ইত্যাদি। বাঁশি, সানাই, শঙ্খ, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাতাসের সাহায্যে বাজিত যন্ত্র আর ঘনবাদ্য বা ধাতববাদ্য– মন্দিরা, কাঁসর, ঘণ্টা, ঝাঁঝ, ঘুঙুর ইত্যাদি।

প্রয়াত গুরু অধ্যাপক ড. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রয়াত প্রখ্যাত অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ড. পল্লব সেনগুপ্ত, প্রয়াত প্রসিদ্ধ ঝুমুর গায়ক পবিত্র ভট্টাচার্য, প্রয়াত নৃত্যকীর্তন গুরু নরোত্তম সান্যাল, নাচনী গুরু শশী মাহাতো, মনসা বা ওঝা নৃত্যের গুরু প্রয়াত মুকুন্দ দাস ভট্টাচার্য প্রমুখর সহযোগিতায় এবং বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ লেখকের সার্বিক সহায়তায় গৌড়ীয় নৃত্য অত্যন্ত গতিশীল ও প্রাণবন্তভাবে এগিয়ে চলেছে। দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুরে 'গৌড়ীয় নৃত্যভারতী' গৌড়ীয় নৃত্য প্রশিক্ষণের মূল শিক্ষায়তন। দেশে-বিদেশে প্রচুর গৌড়ীয় নৃত্যশিল্পী আত্মপ্রকাশ করেছেন। যেমন– গৌড়ীয় নৃত্যের অগ্রগণ্য সেবিকা মহুয়া মুখোপাধ্যায় ও তাঁর পুত্র অয়ম মুখোপাধ্যায় যিনি নৃত্যের পাশাপাশি গৌড়ীয় নৃত্যের যন্ত্রসংগীতও বাজান। এছাড়া আছেন গুরু বনানী চক্রবর্তী, শতাব্দী আচার্য, রঞ্জিমা চ্যাটার্জি, পারমিতা ব্যানার্জি, সহেলী পাল, সৌম্য ভৌমিক, শেখ ওয়াসিম রাজা, বাংলাদেশে র‍্যাচেল অ্যাগনেস পেরিস, আসামে মধুমিতা দাস ভট্টাচার্য, চন্দন মজুমদার, ব্যাঙ্গালোরে দেবযানী দত্ত, পুণেয় পৌলমী চ্যাটার্জি, দিল্লিতে শ্রীরূপা চ্যাটার্জি প্রমুখ। এইভাবে গৌড়ীয় নৃত্য এগিয়ে চলেছে।

অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ভারতের গৌড়ীয় সংগীত গবেষক

ছোটগল্প

মেঘা, পিউ ও একটি আয়না

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

আয়নার দিকে তাকিয়ে বুঝল বিকাশ– বিকেল হয়েছে। কিচ্ছু করার নেই– হেমন্তের বিকেলকে বিকাশ ভালই চেনে, তার ওপর ওই আয়নাটা। ওর মধ্য দিয়ে উল্টোদিকের আতাগাছ, আরো অনেক কিছু টের পায় বিকাশ। তারও তো বয়স হল, প্রায় ৪৮, তারও তো চুলের সিকিভাগই সাদা কাশফুল– রোজ ভোরে তিন-চারটে করে তোলা সত্ত্বেও– এপাড়ায় বিকাশকে যারা চেনে না তাদের জন্য করুণা হয়। হ্যাঁ তারা পাড়ায় চাঁদা তোলে না একথা ঠিক। তারা হয়তো সকাল ৯টার আগেই ট্রেন ধরতে বেরিয়ে যায় এবং প্রতি রবিবার মিশিরের কাছ থেকে কিনে আনে দেশি মুরগির মাংস। তাদের ছেলেরা কদাচিৎ বাড়ির বাইরে বেরোয়। ইস্কুল-কলেজ-কম্পিউটারের ঘেরাটোপে ব্যস্ত থাকে তারা। হয়তো তারা আড্ডা মারে সিটি সেন্টারে, এখানে তাদের বন্ধু নেই। আর মেয়েদের শহরের কলেজে যেতে হলেও আসতে-যেতে কানে গোঁজা থাকে সেলফোন। সুতরাং এই যাওয়া তো নয় যাওয়া।

যা বলছিলাম, বিকাশকে চিনলে তার বাড়িতে চলে আসাও খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। সত্যিই কি তাই? কারণ সেও বাড়িতে থাকা পছন্দ করে না কিন্তু প্রায় সারাক্ষণই ১তলার ঘরে আয়নায় চোখ রেখে বসে থাকে। বিকাশ হাজরা একজন আইনজীবী। সে সন্ধেবেলা ২ঘণ্টা বাড়ির চেম্বারে বসে কী করে তা আলোচ্য বিষয় নয়। কথাটা হল তার চলাফেরায় সমস্যা আছে। ৩বছর আগে ব্যাঙ্গালোরে বাস অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকেই সে স্বেচ্ছাগৃহবন্দী। খুব দরকার পড়লে কোর্টে যায় না তা নয়। তবে সঙ্গে থাকে ক্রাচ আর ভাড়ার গাড়ি। তপনের গাড়ির রেট ঘণ্টায় ৬০টাকা। কিলোমিটারে একটু বেশিই পড়ে যায়। তার কেসগুলো নিয়ে কোর্টে যাতায়াত করে পিউ।

পিউ ব্যানার্জি। পিউ ২৭, হাইট ৫ফুট ২ইঞ্চি, চোখের রং কটা। অল্প হিল পরে, নাকছাবি নেই। নখে রঙ নেই। বিকাশের বাড়ির সামনে বেশ খানিকটা বাগান ও গাছপালা। বাড়ির পেছনে দত্তদের পুকুর, যেখানে এখনও ঘাই মারে মাছের দল। আর তারই লোভে পুকুরের পাশে পেঁপে গাছে লুকিয়ে থাকে মাছরাঙা। আর তার পুরুষ সঙ্গীটির কর্কশ চিৎকারে রোজ সকালে মেডিটেশন চটকে যায় বিকাশের। মানে প্রাণায়ামের পর যা করা হয়। আরো অনেক কারণেও যায় কিন্তু সে-সব আলাদা ব্যাপার।

আয়নার ভেতর দিয়ে বিকেল দেখতে দেখতে কখন যেন সাড়ে চারটে বেজে যায়। ভেতরের ঘরে দেয়ালঘড়িটায় ঢং করে বাজে এক পুরনো আওয়াজ, হঠাৎই আয়না থেকে চোখ তুলে ও দরজার দিকে তাকায়। বিকাশের সেফুদি, অর্থাৎ তার বিধবা পিসতুতো দিদি, যে গত তিরিশ বছর ধরে এ বাড়িতে থেকে গেছে, নিয়ে আসে এক পেয়ালা গরম চা। লাল রংয়ের, সুগন্ধী, চিনি ও দুধছাড়া, যাতে আছে একফোঁটা লেবুর নির্যাস ও কয়েককুচি আদা।

আয়নার ভেতর দিয়ে বিকেল দেখতে দেখতে কখন যেন সাড়ে চারটে বেজে যায়। ভেতরের ঘরে দেয়ালঘড়িটায় ঢং করে বাজে এক পুরনো আওয়াজ, হঠাৎই আয়না থেকে চোখ তুলে ও দরজার দিকে তাকায়। বিকাশের সেফুদি, অর্থাৎ তার বিধবা পিসতুতো দিদি, যে গত তিরিশ বছর ধরে এ বাড়িতে থেকে গেছে, নিয়ে আসে এক পেয়ালা গরম চা। লাল রঙের, সুগন্ধী, চিনি ও দুধছাড়া, যাতে আছে একফোঁটা লেবুর নির্যাস ও কয়েককুচি আদা। ওই চায়ে চুমুক দিতে দিতে বিকাশের চোখের সামনেই পোস্ট-শরতের বিকেল ঢলে পড়ে সন্ধের দিকে। ঠিক ৫টার সময় মোরামে মোড়া লাল সুরকির ওপর দিয়ে বাগান ও বারান্দা পেরিয়ে ঘরে ঢোকে পিউ। তার কালো ওকালতির জোব্বাটা ভেতরের ঘরে রেখে যায় বাথরুমে। সামান্য প্রসাধন সেরে ঠিক ৫টা ১৫-য় ঘরে ঢুকলে ঘরের আবহাওয়া পাল্টে যায়। সেফুদি যে ঘরে থাকে সেখান থেকে টিভিতে তারা মিউজিকের রবীন্দ্রসংগীত ভেসে আসে। কখনো শ্রেয়া গুহঠাকুরতা, কখনো শ্রাবণী সেন। বিকাশ জানে পিউ না এলে অর্থাৎ রবিবার ওই গানগুলোও কেন যেন বন্ধ থাকে। এমনও হতে পারে টিভি বন্ধ অথবা অন্য কিছু চলছে, সিনেমা বা সিরিয়াল, হয়তো সেফুদি তার পোষা বেড়ালদের নিয়ে আদিখ্যেতা করছে বা কিছু একটা... কিন্তু হ্যাঁ, কোনও এক রবিবার, বন্যার গলায়, ওই যে, আমি যতবার আলো জ্বালাতে... শোনেনি কি বিকাশ? নিভে যায় বারে বারে শুনে কেঁপে যায়নি কি? তবে? পিউ মোটামুটি ৫দিনই আসে, ৫টা থেকে ৮টা, এমনকি কোনও কোনও শনিবারেও। কোনও কোনও শনিবার ও নিয়ে আসে কড়া ভাজা গরম কচুরি আর লঙ্কা দেওয়া হিংয়ের তরকারি, দ্বিতীয় কাপ চায়ের সঙ্গে এই খাদ্যপিণ্ডকে অমৃত মনে হয় বিকাশের। কিন্তু অধুনা টাইপ-টু ডায়াবেটিসের কবলে পড়া বিকাশ জানে এই মনে হওয়াটা ভুল। যে কারণে ওকে সপ্তাহে ৬দিন ভোরে খেতে হয় ৪০মি.গ্রা. প্যান্টোসিড, তবুও। তরকারিতে দেওয়া শুকনো লঙ্কা চিবিয়ে ফেলে বিকাশ প্রায়শই। তারপরই হেঁচকি। ১টার পর ১টা। জল খেয়েও থামে না। তখনই পিউ-এর ব্যাগের সাইড পকেট থেকে বেরোয় গুড়বাদামের তক্তি। দুটো কামড় আর হেঁচকি ভ্যানিশ। এরপর ১টি ২টি করে মক্কেল আসে আর পিউ তাদের সামলায়। প্রয়োজনমত বিকাশও কথা বলে। তার বসার চেয়ার থেকে ছায়াটা উলটো হয়ে লুটোয় ঘরের মেঝেয়– যেখানে মশা ও লাল পিঁপড়েরা পর্যায়ক্রমে মক্কেলদের ঠ্যাং ও গুঁড়ো বিস্কুটোর লোভে ছুটে আসে। ফিজগুলো বিকাশের সামনেই কাচের আলমারিতে যত্ন করে তুলে রাখে পিউ। তারপর একসময় ফিরে যায়।

পিউ চলে যাওয়ার পর পুবদিকের গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারে চাঁদ। বিকাশ গলা তুলে সেফুদিকে বলে: আইজ কী রাধছ? সেফুদি হাসে। সেফুদি ও বিকাশ ডাইনিং টেবিলে বসলে ঊষার মা খাবার পরিবেশন করে। বিকাশের বরাদ্দ ২টো হাতেগড়া রুটি ও তরকারি। শেষপাতে ১কাপ দুধ। সেফুদি শুয়ে পড়লে বিকাশ নিজের ঘরে এসে বসে। একটু খুঁড়িয়ে চলা বিকাশ, ৪৮এর নিঃসঙ্গ, বিপত্নীক বিকাশ এই সময় একটি ফোনের প্রত্যাশায় থাকে। ল্যান্ডফোনে, কারণ ওর সেলফোন নেই। ফোনটি আসে দশটায়। কিছুক্ষণ কথা বলে ফোন রেখে দিয়ে বিকাশ কেস-সংক্রান্ত ফাইল ও বইপত্র নাড়াচাড়া করে। একসময় মশারির ভেতর ঢুকে যায়। ওর মুখে রোজ শুভরাত্রি শব্দটা শুনে শুনে অভ্যস্ত বিকাশ ভাবে মাঝে মাঝে ব্যতিক্রমী হলে ক্ষতি কী? কিন্তু এই কথাটা বলা যাবে না। শুধু অন্তর্মুখী নয়, উকিল হয়েও ও একজন তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন নির্জন পুরুষ। ও যে অনেক কিছুই পারে না তা কি বোঝে না কেউ? অন্তত ১জন?

পিউ সম্বন্ধে নতুন কিছু বলার নেই কেন-না হাইকোর্টে এরকম বুদ্ধিমতী সুন্দরী জুনিয়াররা আক্ষরিক অর্থে প্রিভিলেজড ক্লাসের অন্তর্গত। ক্লায়েন্টরাও তাদের নিয়ে খুশি, বস ও সিনিয়াররাও, মানুষ বলেই নিরপেক্ষ নন। এমনকি বিচারপতিরাও একঘেয়েমির মধ্যেও নতুন মুখের আবির্ভাবে সচকিত হন। পিউও অবাক হয় না। পক্ষপাত পেতে ও অভ্যস্ত। কিন্তু ও নিজে কী চায় তা কি কেউ জানে? ও নিজেও জানে কি? আর জানলেও ওকে বোঝা কঠিন কেন-না ও বেশ কম কথা বলে। তাতে অবশ্য মেঘার কোনও সমস্যা নেই। স্কুল থেকেই মেঘা মিতভাষী এমন অপবাদ ওর চরম শত্রুও দেবে না আশা করি। মেঘা পেশায় ডাক্তার। এই মুহূর্তে এম ডি করছে চর্মরোগ নিয়ে। অর্থাৎ স্কিন। পিউ ওকে বলে: মেঘাস্কিনি– হয়তো ওর চঞ্চলতা আর ভ্রমণকুশলতার কারণে মেঘাস্থিনিসই বলতে চায়, কিন্তু ওই যে কথা কম। মেঘা আর পিউ ক্লাস থ্রি থেকেই একসঙ্গে। হায়ার সেকেন্ডারিতে দু'জনেই সায়েন্স। তারপর জয়েন্ট দিয়ে ১জন ডাক্তারিতে অন্যজন ল কলেজ। নাগের বাজার থেকে বাগুইহাটি কতদূরই-বা। কিন্তু ওদের বাবাদের দুশ্চিন্তায় রেখে ওরা আজও সিংগল। মেঘার অবশ্য অনেক বন্ধু। যেমন সোমনাথ, যেমন আমি, বা সুদর্শনকাকু বা কবীর। কবীর নাগের বাজারে রিকশা চালায়, রিকশার মাথায় বাহারী ছাতা আর হ্যাঁ, ২৪ ঘণ্টা এফএম চলে ওর রিকশায়। কবীর হৃত্বিক রোশনের গানগুলো যা গায় না, পুরো ফাটাফাটি। মেঘা কবীরের দারুণ ভক্ত এবং বুড়ুদি। বুড়ুদির কথা শুরু করলে এই কাহিনির ফোকাসটা নড়ে যাবে তাই আপাতত থাক। যা বলছিলাম, মেঘার বাড়ির ছাদটা অসাধারণ। হাওয়া যেন ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ওইখানে মাদুর পেতে কলেজফেরত মেঘার সঙ্গে কাটিয়েছি বেশ কয়েকটি বিকেলে ও সন্ধে এবং মেঘা ওই সময় খুব একটা কথাও বলেনি। মানে চুপ করে ছিল আর কি। কয়েকবার ডাংগুলি এসে শুয়ে পড়েছে মেঘার কোলে আর সন্দেহের চোখে তাকিয়েছে আমার দিকে। ডাংগুলি মেঘার প্রিয়া বেড়াল যে একা একাই ছাদ জুড়ে ফড়িং তাড়িয়ে বেড়ায় আর মেঘার বন্ধুদের নানাভাবে অপমান করার চেষ্টা করে।

শুধু একবার বলেছিল মেঘা, জানেন তো সোমনাথের সঙ্গে ছাদে বসলে অনেক কিছু জানা যায়। মানে? জিজ্ঞাসু চোখে ওর চোখের দিকে তাকালে মেঘা বলেছে, আপনার কনুইটায়, ওইযে ওখানে কী হয়েছে দেখি। বলে টেনে নিয়েই ইস্‌স্ বলে ছেড়ে দিয়েছে যেন ওটা একটা গরম হাতা বা খুন্তি। ছিঃ শেষে সোরায়সিস বাধালেন। অভিমানী মুখে ঘুরে বসেছে মেঘা। কী হবে এখন? কী আর হবে? রোজ ছোবড়া দিয়ে ঘষবেন চানের সময়, তরপর ভাল করে লাগাবেন ময়শ্চারাইজার, দু'বেলা। মন ভাল করুন। কী এত ভাবেন বলুনতো? আমি জানি সোমনাথ প্রসঙ্গে ও আর কিছু বলবে না এখন। পরে কোনওদিন হয়তো-বা। হয়তো নয়। সেটা ওর মর্জি। পিউ আর মেঘার মধ্যে ভাব আছে জানি। কিন্তু সবুজ চোখের সেই দস্যুটাও কি আছে? মানে যার নাম জেলাসি। তিতির বলেছে, আছে। তিতির কিছুটা হলেও পিউ-এর ঘনিষ্ঠ। আর পিউ-এর সঙ্গে কথা বললে যেটা জানা যায় ওর এবং ওর ফ্যামিলির কারোরই কোনও শ্বাসকষ্ট নেই। এমনকি বিকাশেরও নেই। বিকাশের শ্বাসকষ্ট নেই এটা কোনও সংবাদ নয়। অনেক লোকের তো ৪৮ কেন ৬৮তেও শ্বাসকষ্ট থাকে না। তারা দিব্বি পিঁপড়ের মত পাহাড়ে উঠে যায়, মেট্রোর খাড়া সিঁড়ি ভেঙেও হাঁপায় না। কিন্তু তারা অনেকেই ৬০এর আগেই টেঁসে যায়। আবার অনেকেই টেনে দেয় নব্বই, কি পঁচাশি। তাতে কী হল? হল এটাই যে গতমাসের কোনও এক বাদামি শুক্রবারে ঈষৎ উঠে যাওয়া পাজামার ফাঁকে বিকাশের ডানপায়ের গোড়ালি

বরাবর একটা ক্ষতচিহ্ন আবিষ্কার করল পিউ। ওটা কী? ও কিছু নয় বলে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল বিকাশ, কিন্তু পিউ ঝুঁকে, জায়গাটা ভাল করে দেখে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। না, কিছু তো বটেই। কী? সেফুদিও একমত ওই ক্ষচিহ্নটি দেখতে ভাল নয়। আজকাল কতসব খারাপ রোগ হচ্ছে, একটা ডায়াগনোসিস তো হওয়া দরকার। তারপর না হয় চিকিৎসার কথা ভাবা যাবে। ডাক্তারে অনিচ্ছুক বিকাশের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান ডা. ঘোষ জ্বর ও পেটখারাপ ছাড়া যে-কোন রোগকেই সন্দেহের চোখে দেখেন। তিনিও বললেন একজন স্পেশালিস্ট-এর কথা। কিন্তু ঘনঘটায় রাজি নয় বিকাশ। একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি আমি চাইছি না। শেষ পর্যন্ত রফা হল একটা। মেঘা, যেহেতু পিউ-এর বন্ধু এবং ডাউন অ্যান্ড আউট পেশাদার নয়, তাকেই ভাবা হল ডাকা হবে। প্রথমদিন সে এল পিউয়ের সঙ্গে, শাড়ি পরে। ব্যাগের থেকে বেরুল ম্যাগনিফাইং গ্লাস। কিন্তু কোনও মতামত দিল না। একটা মলম লাগাতে বলে অপেক্ষা করতে বলল দু'হপ্তা। একদিন রবিবার সকালে সে হাজির। সেদিন অবশ্য শাড়ি নয়, জিনস এবং টপ। এটা একধরনের একজিমা, বলে হাসতে লাগল মেঘা। হাসলে মেঘাকে কেমন লাগে তা ঠিক বুঝতে পারল না বিকাশ। তবে বুঝল, তাদের পরিবারে যে হাঁপানিঘটিত রোগ তাতে এই একজিমাকে ব্রাত্য না করলেও চলে যাবে। এর মধ্যে আরো কয়েকবার মেঘা এল, বেছে বেছে রবিবারই। এর পরের আসাগুলো পিউ জানল না, বিকাশ এবং মেঘা জানাল না বলেই তো।

পিউ ও সোমনাথ যে ঘুরে এসেছিল বকখালি (অবশ্যই সঙ্গে ছিল আরও দু'জন, সোমনাথের ইস্কুলের বন্ধু) সেটাও কি ওরা জানিয়েছিল মেঘাকে? জানায়নি, কিন্তু ওই যে, মেঘার ছাদে বসলে যেমন অনেক কিছু জানা যায়, সেভাবেই, বাতাসে ভেসে এল সেই গোপন যাত্রার কাহিনি। কী আর এমন গোপন কথা, কত লোকই তো যায়, নূরপুর থেকে বকখালি। আর ওরা তো দু'বারের সুযোগে চুমু খেয়েছিল মাত্র একবার, সেও বন্ধুদের বাথরুম পেয়েছিল বলেই না। তবে সোমনাথের মনে হয়েছিল মেঘার মত পাগলি না হলেও পিউ বেশ আন্তরিক। আর ঈর্ষা করেছিল বিকাশের ভাগ্যকে।

আজ শনিবার। সকাল থেকেই মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি। দমদম স্টেশনের চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে চায়ের স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, হ্যাঁ, ওই তো বিকাশ। ক্রাচ ছাড়াই, বিকেল চারটে তিরিশ, কার অপেক্ষায়? ওভারব্রিজের ওপর থেকে তাকে লক্ষ্য করছে দু'টি কাক। এবং মেঘা। আজ ওকে দেখাচ্ছে দারুণ। চুড়িদার ও পাঞ্জাবিতে। ওর কথামত বিকাশ কিনে এনেছে দুটো বিটার চকোলেট। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামলেই বিকাশের সঙ্গে দেখা হবে ওর, পাঁচ মিনিট আগেই পেরিয়ে গেছে নির্ধারিত সময়। মেঘা ঘড়ি দেখছে। মেঘা জানে ও চাইলে এক্ষুনি সেরে যাবে বিকাশের শখের একজিমা এবং বংশানুক্রমিক শ্বাসকষ্ট হলেও বিকাশ এসে দাঁড়াবে দমদমে, নাগের বাজারে কিংবা গড়িয়াহাটে। যেখানে ও বলবে। তবে তাতে কী? আমি জানি আর কিছুক্ষণ পর একা একাই ফিরে যাবে মেঘা– আর বাড়ির ছাদে বসে খেলা করবে ডাংগুলির সঙ্গে।

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়
ভারতের কবি গল্পকার চিকিৎসক

বেনাপোল-পেট্রাপোল নো ম্যানস ল্যান্ডে রক্তদান উৎসব

প্রতি বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বেনাপোল-পেট্রাপোল সীমান্তে আলাদা করে অনুষ্ঠান করত বাংলাদেশ ও ভারত। সেই অনুষ্ঠানে শহীদদের স্মরণ, আলোচনা ও নানাবিধ সাংস্কৃতিক আয়োজনে কিছু একটা শূন্যতা থেকেই যেত। বেনাপোল পৌরসভা ও বনগাঁ পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের নো ম্যানস্ ল্যান্ডে এবার প্রথমবারের মত যৌথ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন দুই বাংলার শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা।

'আমার যশোর'-এর উদ্যোগে বেনাপোল পৌরসভা ও বনগাঁ পৌরসভার আয়োজনে এবারই প্রথম অনুষ্ঠিত হয় দুই বাংলার রক্তদান উৎসব। যার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'এপার বাংলার রক্তে বাঁচুক প্রাণ ওপার বাংলার... ওপার বাংলার রক্তে এপার বাংলার...'।

ভ্রাতৃপ্রতিম দু'দেশের মধ্যে রক্তদান হোক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, এ বিষয়কে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠানটি ভিন্ন মাত্রা পায়। রক্তদান উৎসব উদ্বোধনকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, 'এই উদ্যোগের ফলে দুই দেশের সম্পর্ক আরো দৃঢ় হবে।'

রক্তদান উৎসবে বেনাপোল পৌরসভার মেয়র আশরাফুল আলম লিটন এবং বনগাঁ পৌরসভার মেয়র শঙ্কর আঢ্য পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে রক্তদান করেন। সবমিলে ১৮জন বাংলাদেশী এবং ২০জন ভারতীয় নাগরিক রক্তদান করেন। বাংলাদেশী রক্তদাতাদের রক্ত গ্রহণ করে বনগাঁ মহকুমা সদর হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক এবং ভারতীয়দের রক্ত গ্রহণ করে যশোর সদর হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক। অর্থাৎ এ দেশের রক্ত বাঁচাবে ও দেশের মানুষের প্রাণ, ওদেশের রক্ত বাঁচাবে এদেশের মানুষের প্রাণ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে যশোরের *স্বজন সংঘ, আমার যশোর* এবং গোবরডাঙ্গার শ্রীপুরের *রূপায়ণ*।

• বিজ্ঞপ্তি

প্রবন্ধ

মনসা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম চরিত্র 'বেহুলা'

শামসুন নাহার জামান

ড. দীনেশচন্দ্র সেনের 'বেহুলা' একটি সু-প্রাচীন গ্রন্থ। বাঙলার মানুষের ঘরে মনসা-দেবীর ভাসান গান গাওয়া হত। প্রত্যেক জেলায় জেলায় এই ভাসান গান এত প্রিয় ছিল যে চাষা লাঙ্গল হাতে দাঁড়িয়ে এই গীত শ্রবণ করতেন। পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকায় লেখকের উক্তি–

> 'আশাকরি এই উপাখ্যান বঙ্গদেশে চিরকালই আদর ও শ্রদ্ধা লাভ করিবে; ইহাতে আমার নিজের কিছুই নাই। প্রাচীন সাহিত্য হইতে আমি একটি সামান্য প্রতিলিপি গ্রহণ করিয়াছি মাত্র। আধুনিক রুচিতে স্ত্রী-চরিত্রের আদর্শ যেরূপ গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে প্রাচীন একনিষ্ঠ পতিব্রত্যের এই অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্তের প্রতি বঙ্গসাহিত্যে অবহেলার ভাব না আসিয়া পড়ে, ইহাই প্রার্থনীয়। বেহুলা প্রায় সাতশত বৎসরকাল বঙ্গীয় নারী সমাজের আরাধ্য হইয়া আছেন, এবং আশাকরি চিরকালই থাকিবেন।'

বাংলা ভাষার প্রায় জন্মকাল থেকেই খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষার্দ্ধকাল পর্যন্ত নানা লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীকে নিয়ে মঙ্গল কাব্যগুলি রচিত হয়েছিল। এগুলোর গঠন ও প্রকৃতি বিচিত্র হলেও বিষয় এক। কোন দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন। মঙ্গল কাব্যগুলি প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণ ও সংস্কৃত মহাকাব্যের মিশ্রিত আদর্শে লিখিত।

সংস্কৃত পুরাণগুলো লিখিত হয়েছিল বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের পূজনীয় দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারের উদ্দেশে। সেই দেবতার ভক্তবিশেষ কোন রাজা বা দেবাংশ-মহাপুরুষের কীর্তি ও বংশ বিবরণ অবলম্বন করে।

> ‘মঙ্গল কাব্যগুলি গান করিয়া দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার করা হইত।’ সেই গান একটি বিশেষ রকম সুরে হইত এবং সেই সুরকেও মঙ্গল বলিত। যে গান শুনিলে মঙ্গল হয়, যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারিত, যে গান মেলায় গীত এবং যে গান একদিন যাত্রা করিয়া অর্থাৎ আরম্ভ হইয়া আটদিন ব্যাপিয়া চলে তাহাকে মঙ্গল গান বলে।’ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। *চণ্ডীমঙ্গল বোধন* ২য় ভাগ, পৃ. ৮৯৭-৯৮

মঙ্গল কাব্য সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> ‘এই মঙ্গল কাব্যগুলির কাব্যে বাংলা ভাষার প্রথম আত্মোপলব্ধির অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছে।’ *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*, আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রথম পাতা, অষ্টম সংস্কারণ

মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে জনপ্রিয়তার বিচারে মনসামঙ্গল কাব্য প্রধান। এই কাব্যের কাহিনি বাংলার আদিম লোকসমাজে প্রচলিত সর্পপূজার ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। মনসা সম্ভবত নাগবংশসম্ভূত। কালের বিবর্তনে এই নাগই সাপে রূপান্তরিত হওয়ায় জল, জঙ্গল এবং জলাভূমি সমাকীর্ণ বাংলাদেশে তাঁর পূজা প্রবর্তিত হয়। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, ভয় থেকেই অধিকাংশ গ্রাম্য দেবদেবীর আবির্ভাব হয়েছে। সর্পদেবী মনসাই শুধু নয়, বাঘ কুমীর এবং বসন্ত কলেরার দেবদেবীরও সৃষ্টি এভাবে হয়েছে। মনসামঙ্গল এবং মনসার ভাসান গান রাঢ় বঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে সুপ্রচলিত ছিল।

সর্পের অধিষ্ঠাত্রীদেবী মনসা। লৌকিক ভয়ভীতি থেকেই দেবীর উদ্ভব। তাঁর অপর নাম কেতকাপদ্মাবতী। এই দেবীর কাহিনি নিয়ে রচিত কাব্য মনসামঙ্গল নামে পরিচিত। কোথাও-বা পদ্মপুরাণ নামেও অভিহিত হয়েছে। চাঁদ সওদাগরের বিদ্রোহ ও বেহুলার সতীত্ব কাহিনির জন্য মনসামঙ্গল সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মনসামঙ্গল হচ্ছে নিয়তির বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহের কাহিনি।

মনসার ভাসান গান এক সময়ে সাধারণের এত প্রিয় ছিল যে, প্রত্যেকে ভাসান গানের নায়ক চন্দ্রধরের আবাস নিজ জন্মস্থানে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। সে জন্য বেহুলার নিবাস আসলে কোথায় তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। আমরা বেহুলা-লক্ষীন্দরের কাহিনি নিয়ে বিভিন্ন জায়গার সন্ধান পাই। যেমন– বর্ধমানের ষোল ক্রোশ পশ্চিমে একটি চম্পক নগর আছে এবং পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীটিকে বেহুলা নদী বলেও অভিহিত করা হয়। বেহুলা নদীর তীরে যে গ্রাম অবস্থিত তার নাম বেহুলা। বেহুলা নদীর তীরে একটি মন্দির আছে। চাম্পাইয়ের বধূরা বেহুলার বাসরের কথা স্মরণ করে এদিন চম্পাই নগরের বিষহরির দরবারে পূজা পাঠায়। এখনও প্রতি বৎসর বেহুলার মেলা নামে এই গ্রামে এক বিরাট মেলা বসে।

ত্রিপুরা জেলাতেও আরেকটি চম্পক নগর আছে। ধকুরী অঞ্চলের লোকের বিশ্বাস, সেই স্থানেই চাঁদ সদাগরের বাড়ি ছিল। বগুড়ার নিকটবর্তী মহাস্থান বলে একটি স্থান আছে, অনেকে বলেন চাঁদ সদাগর সেখানে রাজত্ব করেছিলেন। দার্জিলিং-এ রণিৎ নদীর তীরে চাঁদ সদাগরের নিবাসভূমি ছিল বলে অনেকে মনে করেন।

এদিকে দিনাজপুরের অন্তর্গত কান্তনগরের নিকটবর্তী সনকা গ্রামে চাঁদ সদাগরের বাড়ির ধ্বংসস্তূপ এখনও বিদ্যমান বলে অনেকের ধারণা। মালদহের চাঁপাইনগর ও নেতা ধোপানীর ঘাট, বীরভূমে নিপুলার মেলা, চট্টগ্রামের চাঁদ সদাগরের দীঘি ও কালু কামারের ভিটার উল্লেখ পাই বিপিনবিহারী নন্দী প্রণীত *চন্দ্রধর* কাব্যের ভূমিকায়। বেহুলার কাহিনির উৎপত্তি এবং চন্দ্রধরের নিবাস নিয়ে নানা মত প্রচলিত। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন,

> ‘নানা কারণে এমন ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, বিহার হইতে কাহিনিটি বাংলাদেশে আসিয়া প্রচারিত হইয়াছে এবং এখানে স্থানীয় কতকগুলি লৌকিক কাহিনি ইহার মধ্যে সংযুক্ত হইয়াছে।’

ড. দীনেশচন্দ্র সেনের মতে,

> ‘যখন বঙ্গস্থানেই চাঁদ সদাগরের আবাসভূমি কল্পিত হইয়াছে, তখন যে-কোন প্রাচীন কবিকে অবলম্বন করিলেই চলিতে পারে। এ স্থলে সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা বিড়ম্বনা।’

মনসামঙ্গল কবিদের মধ্যে আদি কবি হরিদত্ত ছাড়াও নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস, গঙ্গাদাস, দ্বিজ বংশীদাস, কালিদাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ আরও অনেকের নাম পাওয়া যায়। ড. দীনেশচন্দ্র সেন চাঁদের ডিঙ্গার নাম ও পুত্রগণের নাম বংশীদাস হতে গ্রহণ করেছেন এবং বেহুলার সাধনার কালে যে সকল পরীক্ষা হয়েছিল তা কতকটা রূপান্তরিত করে তারই কাব্যের আদর্শে রচনা করেছেন। অন্যসব বিষয়ে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দকেই তিনি প্রধান আশ্রয় হিসাবে নিয়েছেন এবং মূল গল্পের উপর ভিত্তি করেই আখ্যানভাগের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। মনসামঙ্গলের কাহিনি নিয়ে গল্পটি বর্ণিত হলেও প্রধান নারী চরিত্র বেহুলাকে ঘিরেই ঘটনা আবর্তিত হয়েছে– তাই গ্রন্থটির বেহুলা নামকরণই প্রাধান্য পেয়েছে।

মনসামঙ্গল কাব্যে চম্পক নগরের চন্দ্রধর বণিক এবং তার পুত্রবধূ বেহুলার মানবী শক্তিরই জয়গান করা হয়েছে। চাঁদ সদাগর শিবের ভক্ত। দেবসমাজে অপাঙক্তেয় মনসার সঙ্গে সৎমা চণ্ডীর বিরোধ ছিল। নিজের পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে মনসা চাঁদ সদাগরকে নির্দেশ দিলেন। চাঁদ সদাগরের পূজা লাভ করলে শুধু পৃথিবীতে নয়, দেবলোকেও মনসার মর্যাদা স্বীকৃত হবে। কিন্তু চাঁদ মনসার উপর খুব বিরূপ। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে হাতে তিনি শিবের পূজা করেন সেই হাতে দেবী মনসাকে পূজা দেবেন না।

চাঁদের স্ত্রী সনকা স্বামীর অগোচরে মনসার পূজা দিলে চাঁদ ক্রুদ্ধ হয়ে পদাঘাতে মনসার ঘট ভেঙে ফেলেন। মনসার কোপে পড়ে চাঁদ নানাভাবে নির্যাতিত হলেন। সামুদ্রিক ঝড়ে চাঁদ সদাগরের চোদ্দ ডিঙ্গা ডুবে গেল। চাঁদ ছিলেন মহাজ্ঞানের অধিকারী। তার পরম বন্ধু শঙ্কর গাবুড়ী স্বর্গের রজকিনী নেতার বরে অমরত্ব লাভ করেছিল। এই বন্ধুর সাহায্যে এবং মহাজ্ঞান প্রয়োগে চাঁদ মৃতদেহে প্রাণ দান করেন। কিন্তু মনসার কৌশলে চাঁদ শক্তিহীন হয়ে পড়েন এবং একে একে ছয়পুত্রের মৃত্যু হল। সনকা স্বামীর অজ্ঞাতে মনসার পূজা করে পুনরায় পুত্রসন্তানের অধিকারী হলেন। এই পুত্রের নাম লখিন্দর।

উজানী নগরের ধনবান শাহ বেনের অপূর্ব রূপগুণের অধিকারিণী কন্যা বেহুলার সঙ্গে লখিন্দরের বিয়ে হয় কিন্তু মনসার অভিশাপের দরুণ লোহার বাসর ঘরেই কালনাগের দংশনে লখিন্দর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ কলার ভেলায় ভাসিয়ে অজস্র বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে স্বর্গে উপনীত হয় এবং নৃত্য-গীতে দেবতাদের খুশি করে স্বামীর প্রাণভিক্ষা লাভ করে। মহাদেবের বরে লখিন্দরকে নিয়ে বেহুলা পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রত্যাবর্তন করে। বিজয়িনী পুত্রবধূ বেহুলার অনুরোধে চাঁদ সদাগর মনসার উদ্দেশে একটি ফুল ছুঁড়ে দিয়ে মনসাকে সন্তুষ্ট করতে রাজি হলেন। মনসা তাতেই খুশি। এইভাবে মর্ত্যলোকে মনসার পূজা প্রচলিত হল। মনসামঙ্গলের এটিই সংক্ষিপ্ত কাহিনি। বেহুলা উপাখ্যানের সমাপ্তিতে ড. দীনেশচন্দ্র সেনও এই উক্তি করেছেন,

> ‘পদ্মপুরাণে উল্লিখিত আছে, মনসার বরে চাঁদ সদাগর তাঁহার সমস্ত পরিবারবর্গসহ দিব্যধামে গমন করিয়া পরমপদ লাভ করিয়াছিলেন, অতঃপর মনসাদেবীর পূজা জগতে প্রচারিত হইতে আর কোন বাধা রহিল না।’

মধ্যযুগের সমগ্র হিন্দু সমাজটি চাঁদ সদাগরের চরিত্রের মধ্যে রূপলাভ করেছে। মনসা অত্যাচারী রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক এবং চাঁদ সদাগর অত্যাচারিত হিন্দু সমাজের প্রতীক। সেজন্য দেবতা বলে কল্পনা করা সত্ত্বেও যেমন একদিকে মনসার প্রতি সমাজের ঘৃণা দুর্বার হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তেমনি অন্যদিকে অত্যাচারিত চাঁদ সদাগরের প্রতি সহানুভূতি অতলস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

কাহিনির উপসংহারে চাঁদ সদাগরের যে পরাজয় বর্ণনা করা হয়েছে, তা মানুষের কাছে মানুষের পরাজয়, দুঃখিনী পুত্রবধূর কাছে স্নেহশীল এক পিতৃতুল্য হৃদয়ের নির্বিচার আত্মসমর্পণ। এটি রক্তমাংসে গঠিত মানুষেরই দুর্বলতার পরিচায়ক। একদিকে চাঁদ সদাগর চরিত্রের বলিষ্ঠ ভূমিকা, অন্যদিকে সনকা-বেহুলার সকরুণ চিত্র– এই বিপরীতমুখী আদর্শের পরস্পর সংঘাতে মনসামঙ্গল কাব্য এক অপূর্ব রস-রূপ ধারণ করেছে।

আদর্শবাদী সমাজের আদর্শ চরিত্রসৃষ্টি বেহুলা। বেহুলা একাধারে রামায়ণের সীতা ও মহাভারতের সাবিত্রী, দুঃখ-সহনশীলতায় সে সীতা, মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করবার শক্তিতে সে সাবিত্রী। বেহুলার সহনশীলতা

অপেক্ষাও তার নির্ভীক তেজস্বিতাই যেন সকলের মন অধিক আকৃষ্ট করে। দেবশক্তি বেহুলার একাগ্র সাধনার কাছে যেন মাথা নত করতে বাধ্য হল। মনসামঙ্গল কাব্যের গতানুগতিক কাহিনি অবলম্বনে ড. দীনেশচন্দ্র সেন 'বেহুলা' গদ্যগ্রন্থটি রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বিশেষত্ব এখানেই যে তিনি গ্রন্থটির পঞ্চম সংস্করণ নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর রচনাশৈলীর গুণেই তা সম্ভব হয়েছে। পাঠকের কাছে গ্রন্থটি সমাদৃত হয়েছে এবং চিরকাল এর আবেদন অনস্বীকার্য।

দীনেশচন্দ্র সেনের বর্ণনা ও রচনাশৈলীর গুণে বেহুলার গতানুগতিক কাহিনিটি নতুন আঙ্গিক ও অবয়বে উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে গ্রন্থটির কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল:

'মনসার কোপে পড়ে চাঁদ নানাভাবে নির্যাতিত হলেন: 'চাঁদবেণে এই অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। সনকা স্বামীর এই অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সাত ডিঙ্গা ডুবিয়া গিয়াছে– তাঁদের বড় সাধের 'মধুকর' ডিঙ্গাখানি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া জলমগ্ন হইয়াছে, শুনিয়া সনসা শোকবিহ্বল হইলেন। লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইলে উপর্যুপরি বিপৎপাত হয়; নির্ব্বংশ সদাগরের গৃহে লক্ষ্মীঠাকুরাণীর পাদপদ্মের অলক্তরূপ মুছিয়া যাইতেছে, 'মধুকর' ডিঙ্গার নাশে সনকা তাহারই আভাস পাইলেন, সনকা তাই কাঁদিয়া সদাগরের নিকট বিনাইয়া বিনাইয়া বারংবার শুধাইতে লাগিলেন:

'শুন সদাগর, কোথা মধুকর
কহ তব পায়ে পড়ি।'

সওদাগর নিজে যে সকল বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহা সনকাকে বলেন নাই; কিন্তু সাধ্বী স্বামীর উন্নত ললাটের কালিমা দর্শনে সেই কষ্টের ইতিহাস বুঝিতে পারিলেন। রাত্রিদিন সনকার মন জ্বলিতে লাগিল। তিনি অশ্রুসিক্ত নেত্র ঊর্দ্ধে উন্নীত করিয়া মনসা দেবীকে বলিলেন,

'আমরা তোমার প্রতি ভক্তি সদাগরের প্রাণে সঞ্চার করিতে পারিলাম না, এমন কাহাকেও আমাদের গৃহে আনিয়া দাও, যাহার চেষ্টায় এই অসাধ্য সাধন হয়, তোমার ঘট তুমি স্থাপিত করিয়া যাও। আমাদিগকে আর কত পরীক্ষা করিবে। আমাদের হৃদয় বড় দৃঢ়, পাষাণ হইলেও বুঝি তা এরূপ কঠোরাঘাতে ভাঙ্গিয়া যাইত।'

আবার সদাগরের বিশালগৃহে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজিয়া উঠিয়াছে। প্রতিবাসিনীরা বলিয়া উঠিল,

'ঐ যা, সনকা রাণীর আর একটি পুত্র জন্মিল, উন্মাদ চন্দ্রধর মনসার সঙ্গে বাদ করিয়া এটিও হারাইবে।'

সনকা সেই সূতিকাগৃহে শিশুর শরচ্চন্দ্রনিভ প্রফুল্ল মুখখানি দেখিলেন; পূর্ণচন্দ্রোদয়ে সমুদ্র যেমন স্ফীত হইয়া উঠে, শোকার্ত মাতৃ-হৃদয়ের সমস্ত নিরুদ্ধস্নেহ সেই শিশুর মুখদর্শনে তেমনি উথলিয়া উঠিল। তিনি জানিতেন, এ পুত্রও মনসাদেবী রাখিবেন না। এক চক্ষের প্রান্তে আশঙ্কাজনিত অশ্রু পতনোন্মুখ হইয়া উঠিল, কিন্তু মাতৃস্নেহ এমনই প্রবল যে, অপর চক্ষু শিশুর বদনচন্দ্রমা দর্শনে প্রীতিপ্রফুল্ল হইল, যেন বহু দিনের জ্বালা সহসা জুড়াইয়া গেল। গৃহ হইতে লক্ষ্মী পাছে অন্তর্হিতা হন, এই ভয়ে সনকা ভীতা ছিলেন, লক্ষ্মীকে ঘরে বাঁধিয়া রাখিবার ফাঁদস্বরূপ পুত্রের নাম 'লক্ষ্মীন্দ্র' রাখিলেন, এই নাম আদরে আদরে শেষে 'লখাই' এবং আরও সংক্ষিপ্ত হইয়া 'লখা'তে পরিণত হইয়াছিল।

'নবযৌবনে লক্ষ্মীন্দর বণিকগৃহের দীপস্বরূপ হইল। একটিমাত্র দীপের জ্যোতিতে যেরূপ সমস্ত আঁধার ঘুচিয়া যায়, সেই বিশাল প্রাসাদ লক্ষ্মীন্দরের রূপে-গুণে তদ্রুপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। লক্ষ্মীন্দরকে সেই গৃহের সকলে 'দুর্লভ লখা' বলিয়া ডাকিত; বড় দুঃখে, বড় কষ্টে ও বড় তপস্যায় 'লখা'কে পাওয়া গিয়াছে, এজন্য সে 'দুর্লভ'।

'লখা এখন নব যৌবনে উপনীত, সে নিজের জাতি ব্যবসায় শিখিয়াছে; কাব্য নাটক অলঙ্কার পাঠ করিয়াছে; সে শুধু চন্দ্রধরের গৃহের গৌরব নহে, সে যেখানে থাকে সেই স্থানের সকলের মুখে আনন্দের রেখা অঙ্কিত হয়– তাহার সঙ্গে আলাপ করিলে লোকে কৃতার্থ বোধ করে। কেবল সদাগর সমস্ত ধর্ম্ম-বুদ্ধির শক্তি সবলে হৃদয়ে উদ্বোধিত করিয়া লখাই হইতে একটু দূরে থাকেন– আদরের ধনকে আদর করিতে সাহস পান না, যাহাকে বক্ষে রাখিবেন, তাহাকে স্বীয় কক্ষে আনিয়া কথা বলিবার সময় মুখ অবনত করিয়া শিব স্মরণ করেন।

'সনকা একদিন সন্ধ্যাকালে স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'আমার দুল্লভ নখার একটি বউ আনিয়া দেও, লক্ষ্মী বৌ অলক্তক-রঞ্জিত নূপুরমুখর ক্রীড়াশীল পদে এই গৃহে বিচরণ করিবে, আমি সেই প্রিয় শব্দ শুনিব এবং আঙ্গিনায় সেই অলক্তক-চিহ্ন দেখিয়া প্রাণ জুড়াইব, আমার স্বর্ণ কৌটা-ভরা সিন্দুর আমি তাহার কপালে পরাইয়া আপনাকে কৃতার্থ করিব।'

তখন নিছনি গ্রামের বণিক সায়-সদাগররের কন্যা বেহুলা প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর হইয়া উঠিয়াছে, বেহুলার কণ্ঠস্বর কোকিলের মত, বেহুলার ন্যায় কোন নর্তকীও নাচিতে পারিত না, বেহুলা রন্ধন কার্য্যে সিদ্ধহস্তা ও সুলেখিকা, আর বেহুলার রূপ দেখিয়া পূর্ণচন্দ্র মলিন হইয়া যাইত, নিতম্বলম্বিত কেশ দেখিয়া কাদম্বিনী আকাশের প্রান্তে লুকাইত। বেহুলাকে প্রতিবেশীগণ ক্ষেপা মেয়ে বলিয়া ডাকিত; এই মেয়ে যেখানে যাইত, সেখানে তাহার কথা লোকে শিরোধার্য করিয়া মানিয়া লইত, তাহার সরল বুদ্ধির কথায় অনেক গৃহস্থের কূটদ্বন্দ্ব মিটিয়া যাইত। যেখানে বেহুলা থাকিত, তাহার নৃত্য গীতে সে স্থানে আনন্দের উৎস ছুটিত, লোকে আদর করিয়া তাহাকে 'বেহুলা নাচুনী' বলিয়া ডাকিত।

'চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে যখন বালিকা 'অরক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে, তখন সায়বেণে বর খুঁজিতে খুঁজিতে পাত্রী সন্ধানে-ভ্রমণশীল জনার্দ্দন শর্ম্মার মুখে চাঁদ সদাগরের পুত্র লক্ষ্মীন্দরের কথা জানিতে পারিলেন। চাঁদ বেণে স্বর্ণ-চতুর্দ্দোলায় চাপিয়া নিছনি নগরে আসিলেন। চাঁদ সায়বেনের গৃহে পরম আদরে আপ্যায়িত হইলেন। মেয়ে দেখিয়া চাঁদের চক্ষু জলপূর্ণ হইল, মেয়ে ত নয়, এ যেন পদ্মাসন ছাড়িয়া লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ভূতলে দাঁড়াইয়াছেন, পায়ের আলতা নহে, উহা রক্তপদ্মের প্রভা। এই বধূকে পাইলে সনকার প্রাণ সত্য সত্যই জুড়াইবে। চাঁদ সায়বেনেকে বলিলেন, মেয়ে তাহার মনোনীত হইয়াছে।

চাঁদ গৃহে আসিয়া বিবাহের উদ্যোগ আরম্ভ করিয়া দিলেন। অপরাপর উদ্যোগ অন্যহস্তে অর্পিত হইল; স্বয়ং চাঁদ, সাঁতালি পর্ব্বতে লৌহের বাসর নির্ম্মান করিতে কামিনা নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং উত্থিত সেই লৌহগৃহের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত রহিলেন। প্রকাণ্ড লৌহের প্রাচীর, লৌহের কপাট, লৌহের ছাঁদ উত্থিত হইল। সাঁতালি পর্বতের প্রস্তর খুঁড়িয়া লৌহময় ভিত্তি নির্ম্মিত হইল, তদুপরি লৌহের তোরণ মেঘ স্পর্শ করিয়া রহিল এবং বিশাল লৌহগৃহ যমপুরী কারাগৃহের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। সেই গৃহের বহির্দ্দেশে শতশত শাস্ত্রী প্রহরী নিযুক্ত রহিল। বহুসংখ্যক নেউল শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া সেই বিশাল লৌহ প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তাহাদের সুতীক্ষ্ণ দন্ত ও নখাগ্র সর্পদেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিবার জন্য উন্নত হইয়া রহিল। নেউলদিগের শ্রেণী হইতে ঈষৎ দূরে ইন্দ্রায়ুধতুল্য পুচ্ছ উন্মুক্ত করিয়া শিখিগণ ভ্রমণ করিতে লাগিল, তাহাদের পদাঙ্গুলী ও চক্ষু সর্প ধরিবার জন্য প্রস্তুত থাকিয়া সাঁতালী পর্বতের গাত্রে তৃণপুষ্প ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। সেই গৃহের চতুর্দ্দিকে বিচিত্র বৃক্ষমূল ও লতাগুল্ম বিক্ষিপ্ত ছিল, তাহাদের তীব্রগন্ধে সর্প সমাজ সাঁতালি পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া দূর দূরান্তে প্রস্থান করিল।

মনসা দেবী আকাশ হইতে এই দৃঢ়রক্ষিত পর্বতদুর্গ দেখিয়া চিন্তান্বিত হইলেন।

তিনি লৌহের বাসর ঘর-নির্ম্মাতাকে দেখা দিয়া বলিলেন, 'একটি কেশ প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ সূক্ষ্ম ছিদ্র লৌহের গৃহ দেয়ালে রাখিতে হইবে।' কামিনা দেবীকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, 'আমাকে সদাগর বেতন ও পুরস্কারাদি প্রদানপূর্বক বিদায় করিয়া দিয়াছেন, এখন যন্ত্র লইয়া কোন ছলে সেই গৃহে পুনঃ প্রবেশ করিব।' দেবী তাহাকে ভয় দেখাইলেন, এমন কে দৃঢ়চেতা পুরুষ আছে সে বিষহরী দেবীর ক্রোধকে ভয় না করে? কামিনা সম্মত হইয়া পুনরায় ভাল করিয়া গৃহ দেখিবার ছলে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র প্রস্তুত করিল এবং তাহা কয়লার গুঁড়াদিয়া পূর্ণ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।'

বেহুলা লক্ষ্মীন্দর ও ছয় ভাশুরসহ মর্ত্যে ফিরে এলে সওদাগরের অন্ধকার ঘর আবার আলোর উৎসবে মুখর হয়ে উঠল। কিন্তু আবার 'হরিষে বিষাদের' মত অজানা আশঙ্কা ঘনিয়ে এল। সভাগৃহে জ্ঞাতি-গোষ্টীর একজন নীলাম্বর বণিক বেহুলার সতীত্ব নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়ল না।

চাঁদের প্রতি রুষ্ট সর্পদেবী মনসার অভিশাপে সর্পাঘাতে একে একে ছয় পুত্র মৃত্যুবরণ করেছে। কাহিনির ধারাবাহিকতায় দেখতে পাই মনসাদেবীর আক্রোশ এবারে চাঁদ সওদাগরের বহু আকাঙ্খিত পুত্র লক্ষ্মীন্দরের উপর। চাঁদের স্ত্রী সনকা গোপনে মনসাকে পূজা দিত বলে, চাঁদ সওদাগর পদাঘাতে মনসার ঘট ভেঙে দেন। এরপর উপরে বর্ণিত অংশ থেকে আমরা জানি সওদাগর বাণিজ্য করতে গেলে কিভাবে সবর্স্ব হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে ঘরে ফেরে। ক্রমান্বয়ে কাহিনি নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যায়... তাদের পুত্র সন্তান লাভ, পুত্রের বাল্য থেকে যৌবনে পদার্পন, পাত্রী সন্ধান, নিছনি গ্রামের বণিক সায় সদাগরের রূপবতী, গুণবতী কন্যা বেহুলার সন্ধান প্রাপ্তি অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে বিবাহ অনুষ্ঠান সমাপন।

মনসার প্রতিহিংসার কথা সদাগর ভোলেন নি তাই স্বয়ং চাঁদ নিজ তত্ত্বাবধানে সাঁতালি পর্ব্বতে লোহার বাসর নির্ম্মাণ করলেন। এখানেও মনসা দেবীর হাত থেকে তার নিস্তার নেই।

এত সাবধানতা অবলম্বন করেও চাঁদ সদাগর কালনাগিনীর দংশন থেকে লক্ষ্মীন্দরকে শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। এরপরের কাহিনি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী।

'কালনাগিনী মনসাদেবীর তাড়া খাইয়া লোহার বাসর ঘরের রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল, ... দ্রুত গতিতে কালনাগিনী লক্ষ্মীন্দরের পদের সন্নিহিত হইল, এমন সময় নিদ্রাবশে পাশ ফিরিতে যাইয়া লখার পদ সর্পের দেহে আঘাত করিল, অমনই কালনাগিনী ফর্না হইয়া তাহাকে দংশন করিল, লক্ষ্মীন্দর চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল–

'জাগ ওগো বেহুলা সায়বেনের ঝি।
তোরে পাইল কাল নিদ্রা মোরে খাইল কি॥'

বেহুলা শশব্যস্তে জাগিয়া দেখিতে পাইলেন, কালনাগিনী দ্রুত গতিতে রন্ধ্রপথে নিস্ক্রান্ত হইতেছে।

সকলে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, স্বামীর শব ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, আলুলায়িতকুন্তলে সিন্দুররঞ্জিত কপালে দেবীর ন্যায় বেহুলা বসিয়া আছেন, তিনি যে অস্ফুটস্বরে রোদন করিতে ছিলেন, সনকার সঙ্গিনীগণ তাহা শোনে নাই, তাহারা বেহুলাকে গালি দিতে লাগিল। 'খণ্ড কপালিনী বেহুলা বিবাহের রাত্রেই স্বামীর জীবন নাশ করিলি। তোর সিঁথির প্রথম সিন্দুর বিন্দু ঘোঁচে নাই, পট্টবস্ত্র মলিন হয় নাই, পদের আলতায় এখনও ধূলি পড়ে নাই, বাসর রাত্রেই দীপ নিবাইলি'–

'খণ্ডকপালিনী বেহুলা চিরুণী দাঁতী
বিহাদিনে খালি পতি না পোহাইতে রাতি।'

... বেহুলার আজ কোন লজ্জা নাই, তিনি স্বামীর শবের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। লখার জন্য পদ্ম-গন্ধি কাষ্ঠের চিতা প্রস্তুত হইল–বেহুলা সেই চিতার পার্শ্বে যাইয়া বলিলেন, 'যদি ইহাকে পোড়াইবে, তবে আমি ইহার সঙ্গে চিতায় প্রবেশ করিব। কিন্তু ইহাকে পোড়াইয়া কাজ নাই, সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে পোড়াইবার নিয়ম নাই, ইহাকে ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দাও, কি জানি যদি কোন রোঝার কৃপায় ইহা প্রাণ পান আর সেই ভেলায় আমি ইহার সঙ্গে যাইব।'

সবার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া স্বামীর শবের পার্শ্বে স্থিরসৌদমিনীর মত সাধ্বী বসিয়া আছেন, গাঙ্গুরের জলে ভেলা ভাসিয়া যাইতেছে, দেখিতে দেখিতে বেহুলা, শব ও ভেলা নদীর তরঙ্গে ভাসিয়া সুদূরে চলিয়া গেল।'

দিনের পর দিন অতিবাহিত হয় বেহুলা স্বামীর কঙ্কালসার দেহ নিয়ে ভেসে চলে–

'অবিরত নেত্রজল নিবারিতে নারি।
নেয়াদার ঘাটে ভাসে বেহুলা সুন্দরী।'

সেইখানে–

পথের পথিক যত পথ বৈয়া যায়।
বেহুলার রূপ দেখি ঘন ঘন চায়।
ত্রিজগত মোহিনী কেন মড়া লৈয়া কোলে।
কলার মান্দাসে ভাসে তরঙ্গ-হিল্লোলে।

এভাবে প্রায় ছয় মাস কেটে গেল। লখাই-এর শীর্ণ দেহে কয়েকখানি হাড়মাত্র অবশিষ্ট রয়েছে। বেহুলাও অকথ্য কষ্টে উপবাসে জীবন্মৃত প্রায়।

বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে নানাধরনের ঘটনা পল্লবিত হয়ে উঠেছে। চমকপ্রদ কাহিনি পাঠককে যেন মোহাবিষ্ট করে তোলে। কাহিনির শেষ প্রান্তে নেতাধোপানীর (যাকে বেহুলা অশরীরী দেবী বলেছেন) মাধ্যমে স্বর্গের দেবসভায় পৌঁছতে সক্ষম হলেন। বেহুলা সংগীত নৃত্যে দেবতাগণকে খুশি করে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চান। পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে মনসা দেবী চাঁদের প্রতি কেন অসন্তুষ্ট সে কথা জানালেন। মহাদেব তাকে আশ্বস্ত করে লক্ষ্মীন্দরকে পুনর্জীবিত করার আশ্বাস দিলেন। চাঁদ সদাগর যাতে মনসার পূজা করে, তিনি সে ব্যবস্থা করার অঙ্গীকার করলেন। মহাদেবের বরে জীবিত লক্ষ্মীন্দরকে নিয়ে বেহুলা মর্ত্যলোকে প্রত্যাবর্তন করলেন। বেহুলা যুক্ত করে মনসাকে বললেন,

'আমি স্বামী লইয়া আনন্দে গৃহে ফিরিব, আমার ছয়টি জা' শাঁখাসিন্দুর বর্জিত হইয়া নিরামিষ হাঁড়ি লইয়া পরিতৃপ্ত থাকিবেন– তাহা কেমন করিয়া সহিব? মা বিষহরি, দাসীকে ভাশুরদিগের জীবন ভিক্ষা দান করুন।'

বিজয়িনী পুত্রবধূ বেহুলার অনুরোধে চাঁদ সওদগর মনসার উদ্দেশ্যে একটি ফুল ছুঁড়ে দিয়ে মনসাকে সন্তুষ্ট করতে রাজি হলেন। মনসা এতেই তুষ্ট। এভাবেই মর্ত্যলোকে মনসার পূজা প্রচলিত হয়।

বেহুলা লক্ষ্মীন্দর ও ছয় ভাশুরসহ মর্ত্যে ফিরে এলে সওদাগরের অন্ধকার ঘর আবার আলোর উৎসবে মুখর হয়ে উঠল। কিন্তু আবার 'হরিষে বিষাদের' মত অজানা আশঙ্কা ঘনিয়ে এল। সভাগৃহে জ্ঞাতি-গোষ্টীর একজন নীলাম্বর বণিক বেহুলার সতীত্ব নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়ল না। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বেহুলাকে তিন প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবে সে গৃহে স্থান পাবে। চাঁদ সদাগর রাগে-দুঃখে নিরুত্তর রইলেন।

বেহুলা লজ্জা ত্যাগ করে সভায় উপনীত হলেন, তিনি অবনত মস্তকে যুক্ত করে সকলকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,

'আমার পরীক্ষার কোন প্রয়োজন নাই। আমি স্বামীর জীবন প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা লাভ করিয়াছি– আপনারা আমাকে বর্জন করিতে চাহিতেছেন, আমি নিজ হইতে বিদায় লইতেছি।'

এই বলে বেহুলা সভাগৃহে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে দেখলেন– বেহুলার দেহে প্রাণ নাই।

'অকস্মাৎ ঊর্ধ্ব হইতে একটি বিদ্যুৎপূর্ণ জ্যোতি সেই সভাগৃহে প্রবেশ করিলে সকলে বিস্মিত নেত্রে দেখিলেন, সেই বিদ্যুৎমালায় অলঙ্কৃত হইয়া বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দর স্বর্গপক্ষে বিলীন হইয়া যাইতেছেন।'

এখানেই কাহিনির পরিসমাপ্তি।

একদিকে চাঁদ সদাগর চরিত্রের বলিষ্ঠ ভূমিকা অন্যদিকে সনকা-বেহুলার সকরুণ চিত্র এদের বিপরীতমুখী আদর্শের পরস্পর সংঘাতে মনমামঙ্গল কাব্যের 'বেহুলা' কাহিনি এক অপূর্ব রসরূপ ধারণ করেছে।

BE 100% SURE
Dettol
BPMPA
PRIVATE MEDICAL PRACTITIONERS ASSOCIATION BANGLADESH ESTD 1977
Proud Partner of
icddr,b
ডেটল সাবান সুরক্ষা দেয় ১০০ রোগবাহী জীবাণু পর্যন্ত#
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত যে নতুন ডেটল সাবান আপনার পরিবারকে ১০০টি পর্যন্ত রোগবাহী জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়। এজন্যই ডাক্তাররা সবসময় পরামর্শ দিয়ে আসছেন ডেটল ব্যবহার করার জন্য।
নতুন
সুরক্ষা দেয়
১০০
রোগবাহী জীবাণু পর্যন্ত#
সুরক্ষা দেয় ১০০ পর্যন্ত রোগবাহী জীবাণু থেকে*
Dettol
BE 100% SURE
original
TRUSTED PROTECTION
This is supported by Microbiological assessments versus bacteria and fungi at an external GLP facility (Bioscience Laboratories, Bozeman, Montana, USA)
** Dettol Original Soap is a Grade-1 soap
f DettolBD

নমস্য কালিকাপ্রসাদ

সুর যার মাটির গন্ধমাখা

এমিলি জামান

অকালপ্রয়াত নমস্য শিল্পী কালিকাপ্রসাদের পারিবারিক আবহ ছিল সঙ্গীত-সুরভিত। আসামের শিলচরের ভট্টাচার্য পরিবারের সন্তান ছিলেন তিনি। সংগীত উপাসক পিতা রামচন্দ্র ভট্টাচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শাস্ত্রীয় সংগীতচর্চায় ব্যাপৃত না হয়ে পিতৃব্যের অনুপ্রেরণায় নিমজ্জিত হয়েছিলেন লোকগানের শীতল গভীর সুরসরোবরে। কাকা অনন্ত ভট্টাচার্য প্রায় হাজার ছয়েক লোকগীতির সংগ্রাহক ছিলেন। শৈশব থেকে কালিকার স্নায়ু লোকজ সুরের ঐশ্বর্যে ঋদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে প্রাণবন্ত তরুণ কালিকাপ্রসাদ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল দিনগুলোয় তার বন্ধুদেরকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে তোলেন গানের দল *দোহার*। *দোহার*-এর কর্ণধার তার সুরসূত্রে যখন দুই বাংলাকে একসঙ্গে বাঁধার উদ্যোগ নিলেন, ঠিক তখনই তাঁকে চলে যেতে হল তাঁর প্রাণপ্রিয় মাটির পৃথিবী ছেড়ে।

যুগধর্মের প্রতীক হয়ে সবাই যখন পশ্চিমি সুরের প্রগ্রেসিভ রক-ঘরানার গান নিয়ে মেতে উঠেছে, তখন *দোহার* নিঃসন্দেহে একটি

ব্যতিক্রমী শুভ উদ্যোগ। *দোহার* বাংলার মৌলিক সম্পদ বাউল, কীর্তন, ঝুমুর, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, চটকা ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেছে। *দোহার*-এর লক্ষ্য এবং তার নিজস্ব সংগীতভাবনা বিবৃত করতে গিয়ে কালিকা বলেছিলেন– 'আমরা লোকগান গাই। নতুন গান লিখি না বা গাই না। আমাদের গানে পশ্চিমি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় না। সেই জন্যই *দোহার* গানের দল। ব্যান্ড নয়।'

মাতৃভূমি ভারতের প্রতিবেশী দেশ 'বাংলাদেশ' কালিকার স্পর্শকাতর মনে জায়গা করে নিয়েছিল। সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত *ভুবনমাঝি*তে একারণেই তার সংগীত পরিচালনা করা। সিনেমায় কালিকার গান আগেও দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। গৌতম ঘোষের *মনের মানুষ* আর সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের *জাতিস্মর*-এ। অন্তরের তাগিদেই বাংলাদেশের *ভুবনমাঝি*তে সংগীত পরিচালনা করেছিলেন কালিকা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং চলতি সময়ের বিপন্নতা *ভুবনমাঝি*র মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ছবিটিতে স্থান পেয়েছে মাত্র চারটি গান। চলতি ধারার বাংলা ছায়াছবির মত *ভুবনমাঝি*তে গানের সংখ্যাধিক্য নেই। কিন্তু সারা ছবিজুড়ে যে গীতল শীতলতা তা কালিকার প্রতিভা ও অন্তরঙ্গতার হীরকোজ্জ্বল নিদর্শন।

ইতোমধ্যেই ইউ-টিউবের মাধ্যমে 'আমি তোমারই নাম গাই' গানটি তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা পেয়েছে। অনাড়ম্বর সরল সুরের গানটি শ্রোতাসাধারণের মন ছুঁয়ে যায়। অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় দৈহিক অস্তিত্ব হারিয়ে গেলেও সৃজনসরোবরে কালিকা নিয়ত সঞ্চরমান। পৃথিবীতে কেউই কারো বিকল্প হতে পারে না। আরো একজন কালিকাপ্রসাদ সত্বর আবির্ভূত হবেন না, তা দুঃখজনক হলেও সত্য।

স্থান-কালের বাধা ডিঙিয়ে কালিকা সুরজগতে অমর হয়ে থাকবেন। আজ তিনি যেখানেই থাকুন, শুভানুধ্যায়ীদের সবার প্রার্থনায় তাঁর আত্মা প্রশান্তির স্নিগ্ধতায় চিরপ্রসন্ন থাকুক।

এমিলি জামান
সংস্কৃতিকর্মী

০১. ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের উপাশনালয়ে জগন্নাথ হলের সহযোগিতায় ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যসন্ধ্যায় বাংলাদেশের তরুণ শিল্পীদের নৃত্য পরিবেশনা

০২. ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতার পাইকপাড়া'স ইম্প্রেশন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর 'আত্মার সৌরভ' শীর্ষক অডিও-ভিজ্যুয়াল নাটক ও গান পরিবেশনা

০৩. ১৪ মার্চ ২০১৭ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বন ও পরিবেশমন্ত্রী আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

০৪. ১৪ মার্চ ২০১৭ সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে ঢাকার শাহবাগে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে ৭ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত সংগীত এবং নৃত্যানুষ্ঠানের একটি মনোজ্ঞ দৃশ্য

০৫. ১৪ মার্চ ২০১৭ সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে ঢাকার শাহবাগে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে ৭ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এক মনজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আইজিসিসি'র প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

০৬. ২৩ মার্চ ২০১৭ গুলশান ক্লাবের সহযোগিতায় ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত 'বসন্ত উল্লাস' শীর্ষক সংগীতানুষ্ঠানে সা রে গা মা পা'র দুই শিল্পী ইমন চক্রবর্তী ও সোভন গাঙ্গুলির সংগীত পরিবেশনা

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra March-April 2017

ভারতীয় হাই কমিশনের সর্বশেষ তথ্য জানতে আমাদের ওয়েবসাইট, ফেসবুক, টুইটার ও ইউটিউব নিয়মিত ভিজিট করুন, লাইক দিন ও টুইট ফলো করুন:

www.hcidhaka.gov.in

/IndiaInBangladesh

@ihcdhaka

/HCIDhaka